ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শানে ওয়াইসী

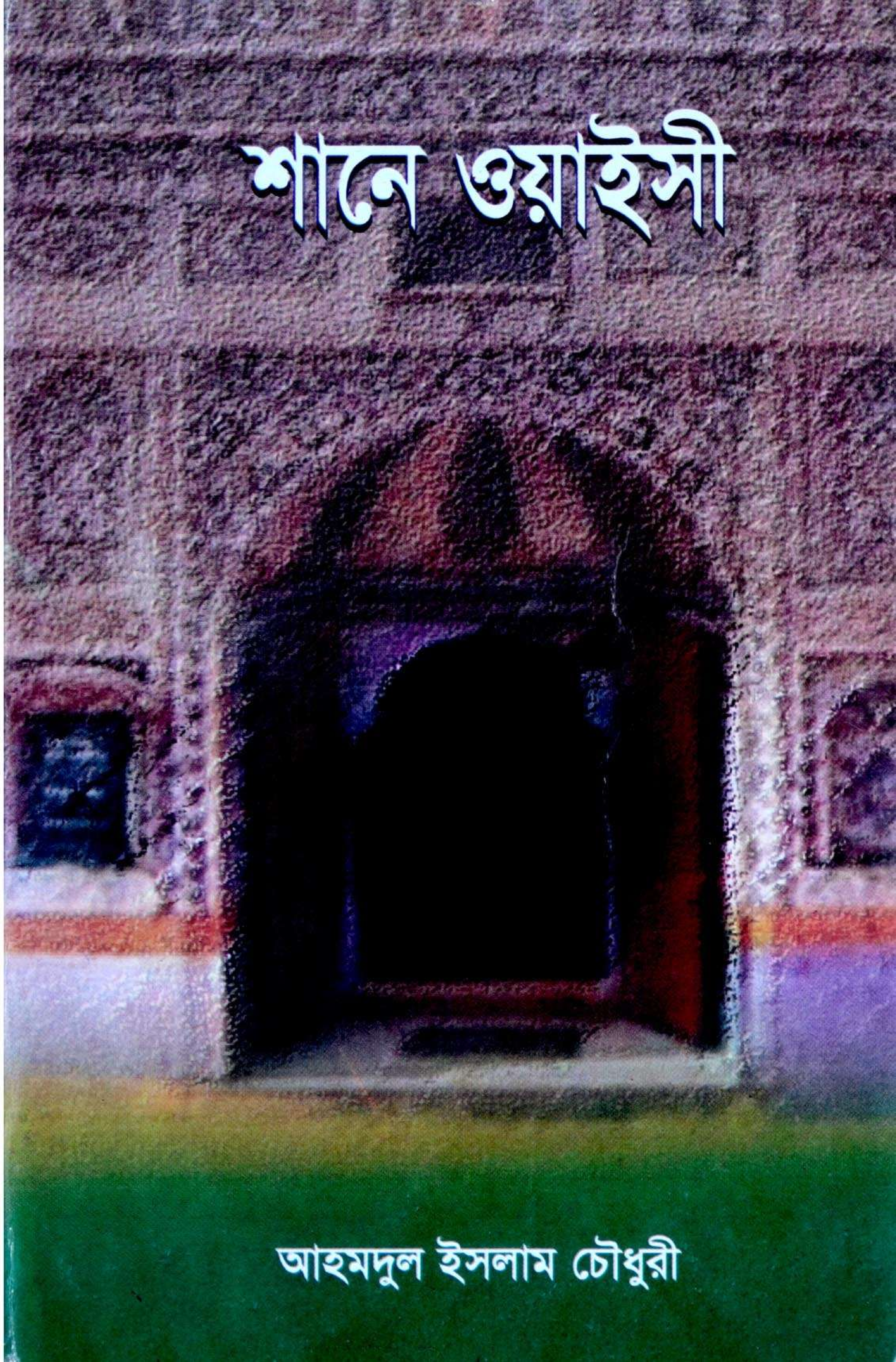

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

শানে ওয়াইসী
আহমদুল ইসলাম চৌধুরী
ইফা প্রকাশনা : ২৫৮৬
ইফা গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭
ISBN : 978-984-06-1363-2
প্রথম প্রকাশ (রাজস্ব)
জুলাই ২০১২
শ্রাবণ ১৪১৯
রমযান ১৪৩৩
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮
প্রচ্ছদ শিল্পী
নবনী কম্পিউটার
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আইউব আলী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ১৩০.০০ টাকা মাত্র

SANEE OAICE : Written by Ahmadul Islam Chowdhury in Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8181538,

E-mail : islamicfoundation-bd.@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation-org.bd.

Price : Tk 130.00 ; US Dollar : 5.00

প্রকাশকের কথা

নবী করীম (সা) বিশ্ববাসীকে যে পরিপূর্ণ জীবন দর্শন উপহার দিয়েছিলেন তাঁর ওফাতের পর তাঁর সুযোগ্য সাহাবীগণ সে ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। সেকালের মুসলমানরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন। তৎকালীন সময় এই বঙ্গদেশেও ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটে। উপমহাদেশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম বা তাবেঈ, তাবে-তাবেঈনদের আবির্ভাব ঘটেছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশে আউলিয়ায়ে কিরাম, সূফী-সাধকদের মাধ্যমে শান্তির ধর্ম ইসলামের অমিয় বাণী প্রচার হয়েছিল। তাঁরা মানবপ্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর অনুকরণ করে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

তাদেরই অন্যতম সূফী-সাধক ছিলেন সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র)। তাঁর বর্ণাঢ্য আলোকিত জীবনাদর্শ নিয়েই প্রখ্যাত মরমী গবেষক আহমদুল ইসলাম চৌধুরী 'শানে ওয়াইসী' নামক পুস্তকটি রচনা করেছেন। লেখক সুনিপুণ লেখনীর দ্বারা ঐতিহাসিক বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। উপমহাদেশে তাঁর ইসলাম প্রচার ও মানবসেবার নানা ঘটনার তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন। আল্লামা ওয়াইসী (র) একজন উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। নিজের কর্মময় জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুপম আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনাকে সর্বসাধারণের নিকটে এনে দিয়েছেন। সরল সহজভাবে পরম সত্য ও প্রভুর সান্নিধ্যে চলার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন সাধারণকে। তাঁর অগণিত ভক্ত ও মুরীদ বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তারই আদর্শ প্রচারে নিয়োজিত রয়েছে। বইটি পাঠ করে পাঠক মানবতাবাদী, উদার আল্লাহওয়ালা ও নবীপ্রেমিক এই বুযুর্গের জীবনের নানা দিক সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। আশাকরি এটি সুখপাঠ্য হিসেবে সমাদৃত হবে। এসব মনীষীদের জীবনাদর্শ সকলের জন্য মূল্যবান পাথেয় হোক এই কামনা করি।

সবদিক বিচারে এটি একটি মূল্যবান বই। এটি আমদের অগণিত পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। পাঠকমহল যদি এতটুকুন উপকৃত হন, তাহলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ

সূচীপত্র

বংশ পরিচয়	১৫
রাসূল নোমা	১৬
জন্মভূমি চট্টগ্রাম	২০
জন্মস্থান	২৫
জন্মকথা	৩০
আব্বাজান	৩৩
জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা	৩৫
আম্মাজানের ইন্তিকাল	৩৭
ভারতে উচ্চশিক্ষা ও জীবন শুরু	৩৯
কর্মজীবন	৪১
দাম্পত্য জীবন	৪২
তরীকত জীবনে পদার্পণ	৪৯
নবীপ্রেম ও দিওয়ানে ওয়াইসী	৫১
জীবনধারা	৫৪
ইন্তিকাল	৫৮
জানাযা ও দাফন	৫৯
আকৃতি ও প্রকৃতি	৬০
পদমর্যাদা	৬৪
নসীহত	৬৫
মাযার শরীফের বর্তমান অবস্থা	৬৭
সন্তান-সন্ততি	৬৯
পুনাশি ও শাহপুরের অবস্থান	৭৫
পীর সাহেব হযরত নিজামপুরী (র)	৭৯
খলিফাগণের তালিকা	৮৬
ক'জন খলিফার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৮৮
কলকাতা নগরী ও তথায় যিয়ারত	১০৫
কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ততা	১১২
চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ	১১৫
জন্মভূমিতে তাঁর নামকরণে মাদ্রাসা	১১৬
সম্পৃক্ত চার ব্যক্তিত্ব	১১৭
শাজারা	১২৪
কারামত	১৩১

পবিত্র কুরআনের বাণী

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۔ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۔

অর্থ : তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তাঁরা বিনম্র। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরাই আল্লাহর দল এবং তাঁরাই বিজয়ী। (সূরা মায়িদা : ৫৫-৫৬)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۔

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (সূরা তাওবা : ১১৯)

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۔

অর্থ : আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল আলেমরাই তাঁকে (বেশি) ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির : ২৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

অর্থ : হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর আর তাঁর দিকে ওসীলা তালাশ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা মায়িদা : ৩৫)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

অর্থ : (মুত্তাকী তাঁরাই) যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় দান করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۔

অর্থ : মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের না কোনো ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে (তাঁরা হচ্ছেন) যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। (সূরা ইউনুস : ৬২-৬৩)

পবিত্র হাদীসের বাণী

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إن الله إذا احب عبدا دعا جبرئيل فقال انى احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبرئيل ثم ينادى فى السماء فيقول إن الله يحب فلا نا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض الخ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোনো বান্দাহকে ভালোবাসেন তখন তিনি জিব্রাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাহকে ভালোবাসি তুমি তাকে ভালোবাস। অতঃপর জিব্রাঈল (আ) তাকে ভালোবাসতে থাকেন। তারপর জিব্রাঈল (আ) আসমানে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাহকে ভালোবাসেন, তখন আসমানবাসী তাঁকে ভালোবাসতে থাকে। অতঃপর ভূ-পৃষ্ঠে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। (মিশকাত)

عن ابى رزين رضى الله عنه إنه قال له رسول الله ﷺ الا ادلك على ملاك هذا الا مرالذى تصيب به خير الدنيا والأخرة . عليك بمجالس اهل الذكر واذا خلوت فحرك لسانك مااستطعت بذكرالله واحب فى الله وابغض فى الله الخ .

হযরত আবূ রযীন (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমি কি তোমাকে এই দীনি ইসলামের বুনিয়াদী কাজ সম্পর্কে নির্দেশনা দান করব না? যদ্বারা তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারবে। তুমি সর্বদা আহলে যিকর তথা আল্লাহকে যারা স্মরণ করে, তাদের বৈঠকসমূহে বসবে আর যখন একাকী হও; তখন যথাসম্ভব আল্লাহর যিকরে নিজের রসনাকে নাড়াচাড়ায় রাখবে। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসবে আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ঘৃণা করবে। (বায়হাকী)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ امرنى ربى بتسع خشية الله فى السر والعلانية وكلمة العدل فى الغضب والرضا والقصد فى الفقر والغنى وأن اصل من قطعنى واعطى من حرمنى واعفو عمن ظلمنى وأن يكون صمتى فكرا ونطقى ذكرا ونظرى عبرة وامر بالعرف وقيل بالمعروف .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) এরশাদ করেন, আমার রব আমাকে নয়টি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা, (২) রাগ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা, (৩) অভাব ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, (৪) যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তাঁর সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করব, (৫) যে আমাকে বঞ্চিত করে তাঁকে আমি হাদিয়া (উপহার) প্রদান করব, (৬) যে আমাকে যুলম করবে তাকে আমি মাফ করে দেব, (৭) আমার নীরবতা যেন ইবাদতে পরিণত হয়; (৮) আমার কথা বলা যেন আল্লাহর যিক্‌রে পরিণত হয়, (৯) আমার দৃষ্টি যেন শিক্ষনীয় হয়, আর আমি যেন সৎকাজের আদেশ দিই। (মিশকাত)

عن ابى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ مثل الذى يذكر ربه والذى لايذكر مثل الحى والميت .

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ (যিকর) করে সে জীবিত আর যে স্মরণ করে না সে মৃততুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ يقول الله تعالى انا عند ظن عبدى بى وانا معه إذا ذكرنى فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذكرنى فى ملإ ذكرته فى ملإ خير منهم .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) এরশাদ করেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমি আমার ব্যাপারে আমার বান্দাহ্‌র ধারণার কাছেই অবস্থান করি। আর আমি তার সাথেই থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সে যদি আমাকে নিজে নিজে স্মরণ করে আমিও তাঁকে নিজে নিজে স্মরণ করি। আর সে যদি আমাকে দলবদ্ধভাবে স্মরণ করে তবে আমি তাঁদের তুলনায় উত্তম দলের কাছে তাঁকে স্মরণ করি। (বুখারী ও মুসলিম)

দিওয়ান-ই-ওয়াইসী থেকে

গযল - ১

প্রথম গযলটি নয় ছত্রে রচিত। এখানে কবি ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) রাসূল (সা)-এর প্রেমকেই দীন ও ঈমান বলেছেন। যেমন তিনি বলেন :

আমার দিওয়ানের প্রথম ছন্দ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রেম হতে উদ্ভূত
তাঁর ছন্দের প্রেমের সূর্য আমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

প্রত্যেক শব্দের তলে আমার প্রাণ দগ্ধকারী ক্রন্দন লুকায়িত আছে।
প্রত্যেকটি অক্ষরের নীচে সুপ্ত আগুন নিহিত আছে।

প্রতি গজল অগ্নিকুণ্ড প্রতি ছন্দ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
আমার ছন্দের প্রতিটি ছত্র প্রজ্বলিত অগ্নিসম।

হে আমার প্রেমের রাজ্যের বাদশাহ পাগলামিই আমার স্বভাব।
তোমার গলির ধূলিই আমার সিংহাসন
তোমার গলিই আমার প্রাসাদ।

আমার বুকের সর্বত্র তোমার প্রেমের ফুলের আঘাতে জর্জরিত হয়ে আছে।
আমার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণ পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়েছে।

বন্ধুর মুখের চেহারা আদি সৃষ্টির সৌন্দর্যের বিকাশ
বন্ধুর চেহারায় আদি নূরের উদয় দেখা যায়।

সে যে আমার বন্ধু তাতে আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত।
খোদা যারে চায় সে আমার প্রাণের আরাধনা।

আমার জীবন সন্ধ্যা শুভ হবে যদি মৃত্যুকালে
আমি হয়রান হই এবং চক্ষু ক্রন্দনরত হয়।

ওয়াইসী তাঁর ধর্ম ও ঈমান সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানে যে
মুহাম্মদের (সা) প্রেমেই আমার ধর্ম এবং তাঁর ভালোবাসাই আমার ঈমান।

গযল - ২

দ্বিতীয় গযলটি আট ছত্রে রচিত। এখাবে কবি রাসূল (সা)-এর প্রেমের মাধ্যমে তিনটি বস্তু লাভের কথা উল্লেখ করেছেন :

তোমাকে ভালোবেসে আমি তিনটি জিনিস পেয়েছি
প্রথম অনুতাপ, দ্বিতীয় ক্রন্দন, তৃতীয় দুঃখ।

এই তিনটি জিনিস হতে আমি আরো তিনটি জিনিসের সঙ্গ পেলাম
প্রথম পরিতাপ, দ্বিতীয় দুঃখ ও তৃতীয় শোক

এই তিনটি জিনিস হতে আরো তিনটি জিনিস আমার হস্তগত হলো
প্রথম দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় দুর্দশা, তৃতীয় ক্লেশ।

এই তিনটি জিনিস হতে আমার প্রাণ অপর তিনটি জিনিস আকর্ষণ করে
প্রথম পাগলামি, দ্বিতীয় দুঃখ, তৃতীয় অনুশোচনা।

এই তিনটি জিনিস হতে আমি অপর তিনটি জিনিসের অধিকারী হয়েছি
প্রথম জ্বালাতন, দ্বিতীয় নিষ্ঠুরতা, তৃতীয় লাঞ্চনা।

এই তিন অবস্থা হতে তিনটি জিনিস আমার অনুবর্তী হয়েছে
প্রথম ছলনা, দ্বিতীয় ক্রন্দন, তৃতীয় শুষ্কতা।

এই তিনটি জিনিস হতে মুহাম্মদের (সা) প্রেম সারা জীবনে
এক অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় সিদ্ধ পুরুষ ও তৃতীয় অতুলনীয় হয়ে গেলাম।

এই তিনটি জিনিস হতে ওয়াইসী পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করে
প্রথম কতল, দ্বিতীয় বিদ্রোহ ও তৃতীয় পাগল হয়েছে।

গযল - ৩

তৃতীয় গযলটি পনের ছত্রে রচিত। এখানে কবি রাসূল (সা)-এর সৌন্দর্য, গুণাবলী ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন :

তোমার সৌন্দর্য স্বর্গের হুরকে পরাস্ত করেছে
তোমার চেহারা অমূল্য মুক্তাকে ম্লান করে দিয়েছে।
তোমার গুণাবলী ধার্মিকগণের কেবলা
তোমার সৌন্দর্য আদি সৌন্দর্যের আয়না।
হযরত ঈসার (আ) অনেক কেচ্ছা তোমার ওষ্ঠে প্রকাশ পায়
ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণে তোমারই বাক্য আরোগ্য দান করে।
তোমার মিলন-বিরহ প্রেমিকের অন্তরে স্বর্গ ও নরকের অবস্থা আনয়ন করে
খোদাপ্রদত্ত তোমার প্রভাবের নিকট বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে।
তোমার বিরহ-বেদনায় আমার হৃদয় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে
তোমার বিরহ-ব্যাথা আর কতকাল সহ্য করব।
হে সুধী যদি তুমি কখনো তার পথ অতিক্রম কর
তাহলে তোমার প্রাণে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করবে।
যেথায় ভোরের বাতাস বহে তাতে প্রাণ পুলকিত হয়
কারণ, ঐ বাতাস তোমার চলার পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।
তোমার ওষ্ঠের এক ফোঁটা পানি হযরত খিজিরের সরোবর সম
তোমার একটি কথায় বিগলিত আমার প্রাণ জীবন্ত হয়ে উঠে।
তোমার আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ চিড়ে দিয়ে
সত্য ধর্মের অবিশ্বাসীগণকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল।
তোমার মুখমণ্ডলে যে বৃত্ত রেখা অঙ্কিত আছে
তারই প্রতিচ্ছবি সূর্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।
মুস্তফার (সা) সত্তা সৃষ্টির সেরা আল্লাহর দয়ার পরিপূর্ণতা
প্রাণপণে তাঁর দয়ার অঞ্চল ধরে রাখবে।
হে নবীকুল শিরোমণি! আমার চোখের উপর তোমার পা রাখ
তোমার পদচিহ্ন আমার বিরহ ব্যথা দূর করবে।
যদিও খোদার আরশ অতি উচ্চে অবস্থিত
তোমার পদ মর্যাদা তা অপেক্ষা কম নয়।
তোমার অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনো সরল পন্থা নেই
ওয়াইসি তাই মন প্রাণ দিয়ে তোমারই পথ অনুসরণ করে।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ পাকের অপার মেহেরবানীতে উপমহাদেশ তথা বিশ্বখ্যাত মহান ওলী, সূফী, কবি, নবীপ্রেমীক ও রাসূল নোমা হযরত সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র)-এর জীবনীর ওপর শানে ওয়াইসী নামকরণে অত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

এ মহান আল্লাহপাকের হাবিবের প্রেমিক হযরত ওয়াইসী (র) ইন্তেকাল ফরমায়েছেন আজ থেকে একশত বছর উর্ধ্বে হয়ে গেছে। অতএব তাঁর ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ নতুনভাবে লেখা সম্ভবের বাইরে। তাঁর মোবারক জীবনের ওপর মোটামোটি ধারণা লাভ করতেই মূলত এ গ্রন্থ।

অপরদিকে তিনি যৌবনকাল বা তারও আগে চট্টগ্রাম থেকে হিজরত করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদে দাম্পত্য জীবন শুরু সহ বসতি স্থাপন করেছিলেন। এতে করে ভারত থেকে তাঁর মোবারক জীবনের ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐসব গ্রন্থ পর্যালোচনা করেও তাঁর ওপর পূর্ণাঙ্গ জীবন প্রাপ্ত হইনি।

তাঁর জন্মভূমির ওপর এবং পৈতৃক তথ্য তালাশে বারে বারে বৃহত্তর সাতকানিয়া ও ঢাকা গমন করি এবং বৃহত্তর ফরিদপুরের (বর্তমান শরীয়তপুর জেলা) সুরেশ্বর দরবারের বর্তমান পীর সাহেব হযরত আলহাজ্ব সূফী সাইয়েদ নূরে আক্তার হোসাইন আহমদী নূরী সাহেবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি। যেহেতু তিনি হযরত ওয়াইসী (র)-এর দরবারের অন্যতম সেবক। তাঁর বিশাল খেদমত রয়েছে।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর মহান জীবনের ওপর তথ্য তালাশে ভারত গমন করি এবং ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল ড. শেখ আহমদ আলী সাহেবের সাথে একাধিকবার সাক্ষাত করি। অর্থাৎ অত্র গ্রন্থকে যতটুকু সম্ভব সমৃদ্ধ করতে আমার প্রচেষ্টায় ত্রুটি করা হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, আমি নগণ্য গ্রন্থকার চট্টগ্রামের সন্তান। অপরদিকে হযরত সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র)-এর পিতামহ সুদূর পবিত্র আরবভূমি থেকে চট্টগ্রামের বৃহত্তর সাতকানিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

বৃহত্তর সাতকানিয়া গারাংগিয়া হযরত বড় হুজুর (র) ও হযরত ছোট হুজুর (র) দুই সহোদর-এর বসতবাড়ী এবং হযরত বড় হুজুর (র) আমার শ্রদ্ধাভাজন

পীর সাহেব হন। তাঁর চার অগ্রজ অর্থাৎ তাঁর পীর ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড়ের হযরত হাফেজ হামেদ আজমগড়ী (র) তাঁর পীর ভারতের হুগলীর বান্ডেলে হযরত সৈয়দ আবদুল বারী (র) তাঁর পীর ভারতের ফুরফুরার হযরত মাওলানা সূফী গোলাম সালমানী (র) হলেন হযরত ওয়াইসী (র)-এর অন্যতম খলিফা।

এতে করে একই জেলার বাসিন্দা হয়ে গারাংগিয়া হামেদিয়া সিলসিলার পক্ষে হযরত ওয়াইসী (র)-এর ওপর একটি গ্রন্থ রচনায় হাত দেওয়া দায়িত্ব বলে মন থেকে দাহ করে আসছিল।

আমি গ্রন্থকার হযরত ওয়াইসী (র)-এর সিলসিলাভুক্ত হই। অপরদিকে আমিরাবাদ ইউনিয়নে আমার আগে থেকে বারে বারে আসা-যাওয়া ছিল। দীর্ঘদিন থেকে ভারত গমনকালে কলকাতার মানিকতলা গিয়ে হযরত ওয়াইসী (র)-এর কবর যিয়ারত করে আসছিলাম বারে বারে। এতে করে গত ক'মাস থেকে মনে মনে কেন জানি বারে বারে দাহ করতে থাকে, হযরত ওয়াইসী (র)-এর ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করার।

ফলশ্রুতিতে গত কয় মাস থেকে তাঁর ওপর একটি গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত সময় কাটাই। এতে বিভিন্নভাবে যাঁরা আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

যেহেতু এই গ্রন্থ হযরত ওয়াইসী (র)-এর পুর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ নয়, শুধুমাত্র মোবারক জীবনের ওপর ধারণা লাভ করতে এই গ্রন্থ এবং তাও তাঁর ইন্তেকালের শতাধিক বছর পর। অতএব এতে নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাটা স্বাভাবিক। কাজেই সম্মানিত পাঠক সমাজের কাছে ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার সবিনয় অনুরোধ রাখছি। সাথে সাথে ত্রুটি-বিচ্যুতি আমি নগণ্য গ্রন্থকারকে অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে শুধরিয়ে নিতে কুণ্ঠিত হবো না।

পরিশেষে, এই মহান আল্লাহ পাকের ওলীর ওপর আমার প্রচেষ্টায় এই শানে ওয়াইসী গ্রন্থের দ্বারা পাঠক ন্যূনতম ধারণা লাভ করলেও শ্রম সার্থক মনে করব। আবারও সম্মানিত পাঠকদের কাছে ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানিয়ে দোয়া কামনা করছি।

প্রারম্ভিক কথা

মহান আল্লাহ পাক মানবের কল্যাণে মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে লক্ষ লক্ষ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

আজ থেকে সোয়া চৌদ্দশত বছর আগে আখেরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর ওফাত থেকে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহে কিয়ামত পর্যন্ত নবী-রাসূলের আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

নবীজী (সা)-এর ওফাতের পর থেকে মানব কল্যাণে নায়েবে রাসূলগণ নবীজীর উত্তরসূরী হিসেবে দীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। তদ্রুপভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশ তথা বিশ্বের বুকে দীনের খেদমতকারী ও আশেকে রাসূল হযরত সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) একটি বিখ্যাত নাম। তিনি ছোটকালে পিতা ও যৌবনের প্রারম্ভে মাতাহারা হয়ে অবিভক্ত বাংলার পশ্চিম অংশে অবস্থান করে দীন ইসলামের ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেন।

তিনি বালাকোটের গাজী হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর হাতে তরীকতে দাখিল হন ও পরবর্তীতে খেলাফত লাভ করেন। ফলশ্রুতিতে তিনি বাংলার পশ্চিম অংশে বসে শরীয়ত ও তরীকতের পাশাপাশি সমান্তরালে ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেন। সাথে সাথে তিনি যে একজন মহান আশেকে রাসূল ছিলেন তা দিবালোকের মতো প্রকাশ পেয়ে যায়। তাঁর ৬৩ মতান্তরে ৭০ বছর বয়সের জিন্দেগীতে কোনো সময়ের জন্য আয়েশের ন্যূনতম কোনো কিছু জানতে পারা যায় না।

তাঁর পূর্বপুরুষ পবিত্র আরবভূমি মক্কা মুকাররমার হলেও তাঁর জন্ম কিন্তু বাংলার বার আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রামে এবং সাথে সাথে তাঁর মহান পীর সাহেবও চট্টগ্রামের।

চট্টগ্রামের প্রথম দিকের আল্লাহর বহু ওলী চট্টগ্রামের একদম উত্তরাংশে পাহাড়, সাগরবেষ্টিত মীরশ্বরাই উপজেলায় শায়িত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মহান আল্লাহর ওলীগণের শায়িতের দিক দিয়ে মনে হয় দ্বিতীয় স্থানে বৃহত্তর সাতকানিয়া (লোহাগাড়া উপজেলাসহ)। এখানে নাম জানা না জানা আল্লাহর বহু ওলী চিরনিদ্রায় শায়িত। এই দুই উপজেলা বাদেও চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্যান্য উপজেলায়

আল্লাহ পাকের মহান ওলীগণকে নিয়ে চট্টগ্রামবাসী গর্ব করতে পারে। তারা যেমন শরীয়ত তেমনি তরীকতকে সামনে রেখে দীন ইসলাম, সাথে সাথে মানব কল্যাণে ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি বলা হয়। অনেক লেখক-গবেষক বার আউলিয়া বলতে বহু আউলিয়া বুঝাতে চেয়েছেন।

হযরত ওয়াইসী (র) শরীয়ত ও তরীকতের খেদমতের পাশাপাশি যে একজন মহান আশেকে রাসূল ছিলেন তা তাঁর জীবনের ওপর আলোকপাত করলে অনায়াসে ভেসে উঠে। নবীজীর শানে তাঁরই গযল, কাসীদা নিয়ে "দিওয়ানে ওয়াইসী" নামক গ্রন্থ উপমহাদেশ পেরিয়ে বিশ্বের বুকে সাড়া জাগায়।

তাঁর বিশাল মুবারক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো তাঁর জগদ্বিখ্যাত উত্তরসূরী রেখে যাওয়া। তিনি তাঁর সুযোগ্য মুরীদগণ থেকে ৩৫ জনকে খিলাফতদানে ভূষিত করেন। তাঁর এসব খলিফাগণের দীনের ও মানবের খেদমত উপমহাদেশ পেরিয়ে বিশ্বের বুকে বিস্তৃত ও একেক জন আলোচিত ও মর্যাদাবান হিসেবে স্বীকৃত। তিনি আরবী ভাষার পাশাপাশি ফারসি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

নবীজীর প্রতি তাঁর প্রেম ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে তাঁর সংস্পর্শে এসে বহু মুসলমান নবীজীর দর্শনলাভে ধন্য হন। তিনি যে রাসূলে নোমা অর্থাৎ রাসূল প্রদর্শক তা সর্বমহলে স্বীকৃত।

বংশ পরিচয়

পবিত্র আরবভূমির মক্কা মুকাররমা হযরত ওয়াইসী (র)-এর পূর্বপুরুষের মূল উৎসস্থল বলে জানতে পারা যায়। তিনি তথা তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ বংশের এবং তাঁদের বংশে হযরত আলী (রা)-এর রক্তধারা প্রবাহিত। সৌদি আরব তথা হেজাজ থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ ইরাকে আগমন করেন। পরবর্তীতে ইরাক থেকে ইরানে অবস্থান করেন বা বসতি স্থাপন করেন। তথা হতে তাঁর বংশের একাংশ আফগানিস্তান হয়ে উপমহাদেশের শতশত বছরের রাজধানী দিল্লীতে এসে বসতি স্থাপন করেন।

পরবর্তীতে মতান্তরে তাঁর পিতামহ হযরত সাইয়েদ হারিস আলী (র) দিল্লী থেকে বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি মহান আল্লাহ পাকের ওলী দরবেশগণের স্মৃতি বিজড়িত স্থান নবীজীর সাহাবার পদভার নিয়ে গর্বিত চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন।

ইসলাম ধর্মের খেদমতে তথা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পবিত্র আরবভূমি থেকে বহু নবীপ্রেমিক আমাদের দেশে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন। তৎমধ্যে সাইয়েদ বংশ, সিদ্দিকী বংশ, ফারুকী বংশসহ নানান বংশধরের পবিত্র আরবীয়গণ রয়েছেন। হযরত ওয়াইসী (র)-এর পূর্বপুরুষও দিল্লী হয়ে চট্টগ্রাম আগমন করেন। তারও আগে বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় ও সোনারগাঁও হয়ে অনেক আরবীয় চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন।

রসূল নোমা

নবীজী (সা)-এর ওফাতের পরে নবী প্রেমিকগণের মধ্যে অনেকেই বিভিন্নভাবে বিশেষ অবদানে মূল্যায়নে বিশেষ সম্মানিত হিসেবে স্বীকৃত রয়েছেন। বিশেষ করে আশেকে রসূল হিসেবে হযরত ওয়ায়েস করনি (র), সুফীতত্ত্বে হযরত ইমাম হাসান বসরী (র), ফিকাহ্ শাস্ত্রে হযরত ইমাম আবূ হানিফা (র), হাদীস শাস্ত্রে হযরত ইমাম বুখারী (র), আওলিয়া সম্রাট হিসেবে হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র), গরীবে নেওয়াজ হিসেবে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (র), কাব্যজগতে হযরত শেখ সাদী (র), ফানাফিল্লা জগতে হযরত মনসুর হল্লাজ (র)-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অপরদিকে রসূল নোমা একটি বিশেষ সম্মানিত লকব। রসূল নোমার সরাসরি অর্থ রসূল প্রদর্শক। অর্থাৎ রসূলকে প্রদর্শনকারী। যিনি রসূল (সা)-কে দেখাতে পারেন, রসূল (সা)-কে দেখানেওয়ালা।

হযরত ওয়াইসী (র) একজন তরীকত জগতের মহান পীর, আশেকে রসূল, নবীজীর শানে বেশি সংখ্যক শের রচনাকারী হয়েও তিনিই যে, একজন রসূল নোমা তা উপমহাদেশ পেরিয়ে বিশ্বের বুকে আলোচিত। অর্থাৎ তিনি যে কাউকে ইচ্ছা করলে রসূল (সা)-কে দেখাতে পারতেন। তিনি একজন আশেকে রসূল হয়ে অতি উচ্চাঙ্গে পৌছতে পেরেছিলেন বলে তাঁর এই প্রাপ্তি বলে স্বীকৃত।

তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনায় তিনি যে রসূল নোমা ছিলেন তা দিবালোকের মতো সত্য হিসেবে ভেসে উঠে। হযরত ওয়াইসী (র) একজন উম্মতে মুহাম্মদী, পীরে তরীকত আশেকে রসূল ছিলেন বিধায় তাঁর মনে বারে বারে দাহ করতেছিল তিনি যাঁর উম্মত তাঁকে তো দেখতেছেন না। যদি উম্মত হিসেবে স্বীকৃতি না পান তাহলে তাঁর দুনিয়া আখিরাত দোজাহান বরবাদ। তিনি এসব চিন্তায় পেরেশানে কালাতিপাত করতে লাগলেন এবং নবীজীকে দেখার জন্য, পাওয়ার জন্য পাগলের মতো হয়ে গেলেন। তাঁর অস্থিরতা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো। এতে করে একদিন তিনি ঠিক করলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি রসূল (সা)-এর দিদার

না হয় তবে তিনি হুগলী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে বিরহদগ্ধ প্রাণকে তুচ্ছ মনে করে পরিত্যাগ করবেন। এক দুই দিন করে সপ্তাহের সাতদিন পার হয়ে গেল। কিন্তু তিনি রসূল (সা)-এর সাক্ষাৎ পেলেন না। সপ্তাহের শেষ দিনটির বিকাল বেলা তিনি সকলের থেকে কৌশলে বিদায় নিয়ে নেন এবং রসূল (সা)-এর প্রেমের বিরহদগ্ধ প্রাণ পরিত্যাগ করতে সূর্যাস্তের পর পর নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। রসূল প্রেমের বিরহ জ্বালার ব্যাকুলতা নিয়ে প্রেমিক পাগল হযরত ওয়াইসী (র) তীরে দাঁড়িয়ে নদীতে ঝাঁপ দিতে সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়লেন।

এই মহাসন্ধিক্ষণে হযরত ওয়াইসী (র) পিছনে অশ্ব পদধ্বনি শুনতে পেলেন এবং কে যেন ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকতেছেন, "ফতেহ থাম! থাম!" তিনি চমকে পশ্চাৎ ফিরা মাত্র রসূল (সা)-কে অশ্ব দৌড়ায়ে তীব্র বেগে আসতে এবং হস্ত মুবারক উর্ধ্বে উত্তোলন করে অপেক্ষা করতে ব্যগ্র কণ্ঠে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

ক্ষণপরে হযরত রসূল (সা) অশ্ব হতে অবতরণপূর্বক তাঁর পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে সস্নেহের তিরস্কার করতে লাগলেন। তদউত্তরে হযরত ওয়াইসী (র) ক্রন্দনরত কণ্ঠে বলেন, "ইয়া রসূলাল্লা (সা)! আপনাকে দীর্ঘকাল না দেখে আমার হৃদয় বিরহব্যথায় অস্থির এবং তা আমার সহ্য করার মতো শক্তি নেই। আজ হতে আপনি ওয়াদা করুন যে, এই গরীব যেন প্রতি মুহূর্তে আপনার দিদার লাভ করে কৃতার্থ হয় এবং প্রাণে অমিয় শান্তি লাভ করে।" হযরত (সা) তৎক্ষণাৎ অনুপম স্মিত হাস্যে "আচ্ছা তাই হোক" বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

সেই হতে হযরত ওয়াইসী (র) বিশ্ব পরিমণ্ডলে রসূল নোমা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এরপর থেকে হযরত ওয়াইসী (র) হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র), সুলতান হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (র), হযরত খাজা মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (র) এবং ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী শেখ আহমদ সরহিন্দী (র)-এর নিকট হতে তাদের ব্যক্তিগত স্নেহ ও পবিত্র নিসবত প্রাপ্ত হন। হযরত ওয়াইসী (র)-এর খানকাহতে একদা ইমাম আবূ হানিফা (র) রূহানিভাবে উপস্থিত হয়ে হযরত ওয়াইসী (র)-কে ইসলামী শরা-শরীয়তের সুগভীর জ্ঞান অর্জন করার ফয়েয প্রদান করেন।

জন্মভূমি চট্টগ্রাম

বিশ্বের বুকে চট্টগ্রাম একটি বহুল আলোচিত ও পরিচিত নাম। বাদশা আওরঙ্গজেব এই চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ। পুর্ব এশিয়ার দিকে যাওয়ার পথে সাহাবাগণ চট্টগ্রামের যমীনে সাময়িক অবস্থান নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীতে তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনসহ অগণিত আরবীয় ওলী, দরবেশ চট্টগ্রামে নবীজী (সা)-এর ধর্ম প্রচার করে গেছেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাভাষা আর চট্টগ্রামের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাভাষা বাংলা সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোত থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু চট্টগ্রামের ভাষা আরবী ভাষার সাথে ওতপ্রোত এবং যা গত জীবনে ছিল, আজকেও আছে, কিয়ামত অবধি থাকবে ইনশাআল্লাহ। চট্টগ্রামের ভাষার বহু শব্দ আরবী শব্দ থেকে আগত। একটা মৌলিক বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হয়। আর তা হলো বাংলাভাষায় 'না' শব্দটি বাক্যের পরে কিন্তু আরবীতে 'না' শব্দটি বাক্যের আগে। তদ্রুপভাবে চট্টগ্রামের ভাষায় 'না' শব্দটি আরবী ভাষার অনুকরণে বাক্যের আগে। 'না' এর আরবী হলো 'লা'। যেমন যাবো না, খাবো না, ইত্যাদি, বাংলাভাষায় ব্যবহৃত 'না' শব্দটি পরে। কিন্তু এই শব্দগুলো চট্টগ্রামে ন খাইয়ুম, ন যাইয়ুম, ন কইরগুম ইত্যাদি। অর্থাৎ 'লা' 'না' আগে।

পবিত্র আরবভূমি থেকে অনেক সাইয়েদ বংশ, সিদ্দিকী বংশ, ফারুকী বংশসহ সাহাবাগণের উত্তরসূরি পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজের জন্মভূমি, পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীকে জীবনের তরে ত্যাগ করে এই উপমহাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন।

সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (র)-এর অনুকরণে অনুসরণে বহু আরবীয় পরিবার উপমহাদেশের রাজধানী দিল্লীসহ নানান স্থানে বসতি স্থাপন করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে গেছেন। কিন্তু বাংলায় আরবীয়গণের বসতি স্থাপনকারীগণের মধ্যে গৌড়, সোনারগাঁও অন্যতম।

বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে রয়েছে মুসলমান রাজা বাদশা নবাবগণের ইতিহাস। অতঃপর সোনারগাঁও। ফলশ্রুতিতে অনেক আরবীয় পরিবার তথায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

চট্টগ্রামে প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা হলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সেকালে আরব রাষ্ট্রের বসরা, এডেন, আলেকজান্দ্রিয়া, আকাবা, সুইস ইত্যাদি বন্দরগুলোর সাথে যোগাযোগ ছিল। অপরদিকে আরবীয়গণ ছিলেন মূলত ব্যবসায়ী। তারা বিশ্বের এক দেশ থেকে আরেক দেশে পণ্য আনা-নেওয়া করতেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে। ফলশ্রুতিতে সাগর-মহাসাগরে সেকালে আরবীয়গণের যাতায়াত-যোগাযোগের প্রাধান্য ছিল। তেমনিভাবে ভৌগলিক অনুকূল অবস্থার কারণে সাগরের সাথে সংযুক্ত কর্ণফুলী নদীতে চট্টগ্রাম বন্দর সেকালেও বিশ্বের বুকে পরিচিতি লাভ করে। অতএব আরবীয়গণ পূর্ব-এশিয়া যাতায়াতকালে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করা অনেকটা স্বাভাবিক মনে করা যায়।

আরবীয় বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ভ্রমণকালে চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে দেখতে পান।

অতএব আরবীয় সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনগণের উসীলায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু হয়ে যায় এবং পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি মুসলিম বসতি বাড়তে থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বাংলার অংশ বলা হলেও ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সারা বাংলার ইতিহাস আর চট্টগ্রামের ইতিহাসের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চল মহান আল্লাহ পাকের প্রাকৃতিক দান। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্ব পাশে পাহাড় পর্বত। পশ্চিম পাশে বঙ্গোপসাগর, এর মধ্যখানে গভীর খরস্রোতা কর্ণফুলী নদীসহ আরো একাধিক নদী ও বড় বড় খাল রয়েছে। ফলে প্রাকৃতিকভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চল সমৃদ্ধ।

যে কেউ সারা বাংলার মানচিত্র দেখলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবস্থানের ভিন্নতা ভেসে উঠবে। ফলে দিল্লী কিংবা গৌড় কর্তৃক বাংলায় অভিযানকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কতটুকু অধিকারে নিয়েছিল তা স্পষ্ট নয় ভৌগলিক ভিন্ন অবস্থানের কারণে।

১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওর স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন। তবে তা দক্ষিণে কতটুকু জয় করেছিলেন স্পষ্ট নয়। তিনি চট্টগ্রামে বহু মসজিদ ও ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ করেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আরাকান-এর সাথে ত্রিপুরার যেমনি যুদ্ধ হয়েছিল তেমনি বাংলার নানান রাজা বাদশা সুলতানগণের সাথেও বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস রয়েছে।

অবশ্য ব্রিটিশের দ্বারা ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এই স্বাধীন আরাকান রাজ্য স্বাধীনতা হারিয়ে বার্মার (মায়ানমার) রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়।

মোঘল বাদশা আওরঙ্গজেব তাঁর ভ্রাতা শাহ সুজার সাথে বাংলার নেতৃত্ব নিয়ে ভ্রাতৃকলহ এবং পরবর্তীতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধে শাহ সুজা পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষার্থে বাংলার পূর্বাংশে এসে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন। শাহ সুজা ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের পশ্চিম পটিয়াস্থ দেয়াং পাহাড়ে সাময়িক যাত্রা বিরতি দেন। অতঃপর বর্তমান চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কটি তাঁর প্রচেষ্টায় তথা তাঁর সঙ্গী সৈন্যসামন্ত ও তাঁরই অর্থব্যয়ে প্রাথমিকভাবে নির্মিত হয়। এই সড়কটি চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ-আকিয়াবের প্রথম নির্মিত সড়ক। ঐ সড়ক দিয়ে ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের ভয়ে শাহ সুজা তখনকার পৃথক রাষ্ট্র (আজকের মায়ানমারের নিয়ন্ত্রণে প্রদেশ) আরাকানে নিরাপত্তার জন্য চলে যান। কিন্তু আরাকান রাজপরিবারের খারাপ দৃষ্টি পড়ে শাহ সুজার বিবাহযোগ্য কন্যাদের প্রতি। শাহ সুজার পরিকল্পনা ছিল তখনকার সময়ে বর্ষাকালে সাগর উত্তপ্ত থাকায় আরাকানে অপেক্ষা করে বর্ষা মৌসুম শেষে সাগর শান্ত হলে তিনি সপরিবারে আকিয়াব থেকে সাগরপথে আরবের দিকে চলে যাবেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, শাহ সুজা পরিবার নিয়ে ততদিন আকিয়াবে শান্তিতে থাকতে পারলেন না।

তিনি আকিয়াবের রাজপরিবারের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে তিনি স্থলে মতান্তরে সাগরে নিহত হন। তাঁর পরিবারের মহিলারা সাগরে আত্মাহুতি দেন।

ভ্রাতার পরিবার-পরিজন নিয়ে করুণ পরিণতির সংবাদ আকিয়াব থেকে সুদূর দিল্লীতে পৌছে যায়। দিল্লীর অধিপতি আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের প্রতিপক্ষ হলেও ভ্রাতার পরিবার পরিজন নিয়ে করুণ পরিণতিতে খুবই ব্যথিত হন। ফলশ্রুতিতে বাদশা আওরঙ্গজেব ক্ষিপ্ত হয়ে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে

নির্দেশ দেন আরাকান রাজাকে আক্রমণ করে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সুবেদার শায়েস্তা খান কালবিলম্ব না করে তার প্রথম পুত্র ও সেনাপ্রধান বুজুর্গ উমেদ খানকে ২৭ জানুয়ারী ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম দখল অভিযানে প্রেরণ করেন। বুজুর্গ উমেদ খানের বাহিনী চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লা দুর্গে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করেন এবং কর্ণফুলীর অপর তীরে আরাকানী দুর্গ দখলসহ চট্টগ্রামে আরাকান রাজের অবসান ঘটিয়ে মোঘল রাজ্যের পত্তন করেন। আরাকানী মগ সৈন্যরা দলে দলে পালাতে থাকে। বহু বাঙ্গালী মুসলমান আরাকানী মগদের হাতে বন্দী ছিল। তারাও মুক্ত হয়ে আরাকানী মগদেরকে তাড়া করে নিয়ে যায়।

আরাকানীরা কক্সবাজারের রামু দুর্গে আশ্রয় নেয়। কিন্তু প্রধান সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খান তারই সেনাপতি মীর মুর্তজাকে রামু দুর্গ অধিকারের জন্য পাঠান। মীর মুর্তজা যুদ্ধ করে রামুর দুর্গ জয় করেন। ফলে সেখান থেকেও আরাকানী সৈন্য পালিয়ে যায়। এই সময় বহু আরাকানী সৈন্য নিহত হয় এবং বন্দী বাঙ্গালী মুসলমানেরা মুক্ত হয়। পরবর্তীতে আরাকানীরা আরো সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অপরদিকে মোঘলরাও গোলান্দাজ বাহিনী প্রেরণ করে মীর মুর্তজার সহায়তায়। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে আরাকানী বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। মোঘল আমলে বাদশা আওরঙ্গজেবের সীমানা বর্তমান কক্সবাজার জেলার কোনো না কোনো অংশে, মতান্তরে নাফ নদী অথবা রামুতে ছিল বলে বিভিন্ন ইতিহাসবিদগণ বিভিন্নভাবে উল্লেখ করে গেছেন।

বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় যেমন মুসলমানগণের নিয়ন্ত্রণে আসার সাথে সাথে আরবীয় ধর্মপ্রেমিকগণ তথায় বসতি স্থাপন করে ধর্ম প্রচার করে গেছেন তেমনিভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চল বাদশা আওরঙ্গজেবের প্রচেষ্টায় মুসলমানগণের নিয়ন্ত্রণে আসার পর উপমহাদেশে বিভিন্ন এলাকা থেকে আরবীয়-অনারবীয়গণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

মূলত বাদশা আওরঙ্গজেবের হস্তক্ষেপে চট্টগ্রাম অঞ্চল মোঘল নিয়ন্ত্রণে আসার পর থেকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয় এবং ব্রিটিশ আমলেও তা বহাল থাকে। ফলশ্রুতিতে টেকনাফ সংলগ্ন নাফ নদীকে সীমানা নির্ধারণ করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়। অর্থাৎ নাফ নদীর এ প্রান্তে চট্টগ্রাম অঞ্চল পূর্ব-পাকিস্তানভুক্ত আজকের বাংলাদেশ। নাফ নদীর অপর প্রান্তে আকিয়াব অঞ্চল, মায়ানমার (বার্মা)-এর সাথে সংযুক্ত একটি প্রদেশ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐসব প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলোতে হযরত ওয়াইসী (র)-এর জন্মস্থান নিয়ে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। ভারতের বা আমাদের দেশের কোনো কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধে আমিরাবাদ স্থলে আমিরাবাজার বা আমিনাবাজার উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো স্থানে আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক ছোবহান গ্রামের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা আমিরাবাজার বা আমিনাবাজার উল্লেখ করেছেন তাঁরা ঐ গ্রামের সাইয়েদ পাড়ায় জন্মস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে যাঁরা আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক ছোবহান গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা হাজীপাড়ায় জন্মস্থান উল্লেখ করেছেন।

আমি গ্রন্থকার যেহেতু চট্টগ্রামের সন্তান কাজেই গ্রন্থের প্রয়োজনের স্বার্থে জন্মস্থান কোনটা সঠিক তা যাচাইয়ের ব্যাপারে সজাগ হই।

এখানে উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক ছোবহান গ্রামে হযরত ওয়াইসী (র)-এর জন্মস্থান মনে করে একাধিকবার যাওয়া-আসা করেছিলাম। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধে এবং ঢাকার প্রবন্ধে আমিরাবাদের সাইয়েদ পাড়ার কথা জানতে পেরে পুনঃ নতুনভাবে উভয়স্থানে তথ্য তালাশে তৎপর হই। এতে করে গত ১২ জুলাই ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলবার দীর্ঘক্ষণ সময় হাতে রেখে উভয় স্থানে গমন করি।

আমিরাবাদ আরাকান মহাসড়কের জংশন হতে প্রায় ১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সাইয়েদ পাড়া। ঐ পাড়ার লোকজনের কবরস্থান নিকটস্থ একটি বৃহদাকারের পুকুরের পাড়ে। ঐ বৃহদাকারের পুকুরকে ওসমানের দীঘি বলে। হযরত মাওলানা সাইয়েদ ইব্রাহীম আল-মাদানী (র) নামক এক মহান আল্লাহর ওলীর মাযার রয়েছে ঐ পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে। প্রথমে তথায় যিয়ারত করে বিভিন্ন লোকজনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। এতে করে জানতে পারি ও বুঝতে পারি —প্রায় শতাধিক ঘরের সাইয়েদ পাড়া, একটি বাড়ি হযরত সাইয়েদ ইব্রাহীম আল-মাদানী (র)-এর ওয়ারিশ বলে দাবী করে আসতেছেন। তাঁদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের ঘরে গমন করি। তাঁদের বক্তব্য মতে ঐ বাড়ির বর্তমান মুরুব্বি সাইয়েদ মোহাম্মদ নূরুল কবির। তাঁর বয়স বর্তমানে ৭০। তাঁরা চার ভাই। অপর তিন ভাই মৃত। তাঁদের পিতা হযরত সাইয়েদ মৌলভী আবদুল হাই (পীর সাহেব), তৎপিতা হযরত সাইয়েদ মাওলানা রাগীবুল্লা (পীর সাহেব), তৎপিতা সাইয়েদ মাওলানা ছানায়ত উল্লাহ্ (পীর সাহেব)।

৭০ বছরের বৃদ্ধ নূরুল কবির সাহেবের সাথে তাঁর মৃত অপর তিন ভাইয়ের পুত্র সাইয়েদ মৌলভী আবদুল মান্নান, সাইয়েদ নুরুল ইসলাম, সাইয়েদ মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনও উপস্থিত ছিলেন।

তাঁদের দাবী হলো—তাঁরা মাওলানা সাইয়েদ ইবরাহীম আল মাদানী (র)-এর ওয়ারিশ। তিনি মদীনা মুনাওয়ারা হতে অন্য দেশ হয়ে তথায় আসেন। সাথে সাথে তাঁরা হযরত ওয়াইসী (র)-এর গোষ্ঠী/বংশধর বলে দৃঢ়ভাবে দাবী করেন। এতে করে আমি তাঁদের নিকট বারে বারে জিজ্ঞেস করতে থাকি, হযরত ওয়াইসী (র)-এর দাদা দিল্লী থেকে এ দেশে এসেছেন। অতএব হযরত মাওলানা ইবরাহীম আল মাদানী (র)-এর বংশধর এবং হযরত ওয়াইসী (র)-এর বংশধর এক হতে পারে না।

এতে করে তাঁরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান। তখন তাঁরা বারে বারে কলকাতা ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে আমিরাবাদ এবং সাইয়েদ পাড়ার যে উল্লেখ আছে তা তাঁদের স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ পেশ করতে থাকেন। এতে করে তাঁদেরকে বলি, আমি গ্রন্থকারের কাছেও ঐসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আছে। অতঃপর তাঁদের পারিবারিক আর. এস খতিয়ান তালাশ করি। এতে করে বাড়ির মুরুব্বি সাইয়েদ নূরুল কবির সাহেব বললেন, তাঁর বড় ছেলে জাহাঙ্গীর আলম ঘরের বাইরে আছে। তার কাছে খতিয়ানসহ বাকী কিছু তথ্য রয়েছে। এতে করে আমি তাঁদের দুর্বল আর্থিক অবস্থা অনুধাবন করে আমার সাথে খতিয়ানসহ অবশিষ্ট তথ্য প্রমাণ নিয়ে যোগাযোগ করতে কিছু টাকা প্রদান করি। সাথে সাথে আমার বিস্তারিত ঠিকানা ও ফোন নম্বর প্রদান করি। সাইয়েদ জাহাঙ্গীর আলম সাহেব আমার সাথে চট্টগ্রাম শহরস্থ বাসায় যোগাযোগ করে আমাকে আশ্বস্ত করতে থাকেন যে, ঢাকাতে তাঁরা যে হযরত ওয়াইসী (র)-এর বংশধর তার তথ্য রয়েছে। এতে করে ঢাকা পুনঃ যাতায়াতের জন্য তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা বিবেচনা করে টাকা পুনঃ প্রদান করি। জাহাঙ্গীর সাহেব ঢাকা থেকে এসে কোনো তথ্য না পেয়ে আমার কাছে হতাশা ব্যক্ত করেন। তারপরও তাঁদেরকে বারে বারে বলতে থাকি আমার কাছে সময় আছে যদি কোনো তথ্য পান আমার সাথে যোগাযোগ করেন। এরই মধ্যে জনাব নূরুল কবির সাহেবের ভাতিজা ডা. মহিউদ্দিন আমার সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাঁরা যে হযরত ওয়াইসী (র)-এর বংশধর তার কোনো সন্তোষজনক তথ্য দিতে অপারগ। পরবর্তীতে

অর্থাৎ গ্রন্থ প্রকাশকালীন সময়ের মধ্যে সৈয়দপাড়ার কেউ আমার সাথে আর টেলিফোনে বা সরাসরি যোগাযোগ করেনি।

হযরত সাইয়েদ মোহাম্মদ ইবরাহিম আলমাদানী (র)-এর প্রতিবছর ওরশ করা হয় যিলহজ্জ মাসের ১৭ তারিখে। এতে সৈয়দ পাড়ার সাইয়েদ বাড়ির নূরুল কবির সাহেব ও পরিবারবর্গ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। বিশেষ করে সৈয়দ নূরুল কবির সাহেবের প্রথম পুত্র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম এই ওরশের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা এবং সৈয়দ ইবরাহীম আলমাদানী (র)-এর মাযারের খাদেম হিসেবে দাবী করে থাকেন। তিনি এও জানান যে তিনি হযরত ইবরাহীম মাদানীর মাজারের খাদেম হিসেবে জীবন কাটাচ্ছেন। আমি গ্রন্থকার মনে করি তাঁরা হযরত মাওলানা সাইয়েদ ইবরাহীম আল-মাদানী (র)-এর বংশধর বলেই সম্ভাবনা প্রবল, হযরত ওয়াইসী (র)-এর বংশধর কিনা তা স্পষ্ট নয়।

ঐদিন ঐ বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটিয়ে আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক ছোবহান গ্রামস্থ হাজী পাড়ায় জনাব আবূল কাশেম সাহেবের বাড়িতে পুনঃগমন করি এবং তথায় ঐ বাড়ির মুরুব্বি ৭০ বছরের বৃদ্ধ আলহাজ্জ আবুল কাশেম চৌধুরীর কাছে বারে বারে প্রশ্ন করতে থাকি যে, হযরত ওয়াইসী (র)-এর গোষ্ঠী হিসেবে তার পক্ষে প্রমাণ কি আছে। জবাবে তিনি জানান হযরত ওয়াইসী (র)-এরা তিন ভাই। তৎমধ্যে এক ভাই হযরত ওয়াইসী (র), অপর ভাই হযরত সাইয়েদ সালেহ আলী (র)-বার্মায় (মায়ানমার) হিজরত করেন, তৃতীয় ভাইয়ের ওয়ারিশ তাঁরা এবং তাঁর দাদা আশরফ আলী চৌধুরী হযরত ওয়াইসী (র)-এর আপন ভাতিজা। আমি পুনঃপ্রশ্ন করি তাদের নামের আগে সাইয়েদ নাই কেন এবং নামের পরে চৌধুরী কেন। এতে করে তিনি আমাকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, বিট্রিশের শেষের দিকে এসে জমিদারী প্রচলন ও প্রভাবের কারণে নামের টাইটেলের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়।

তাঁর মতে, তাঁর দাদা হযরত ওয়াইসী (র)-এর ভাতিজা আশরফ আলীর নাম হযরত ওয়াইসী (র)-এর মূল নামের সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ হযরত ফতেহ্ আলী এবং আশরফ আলী। তবে নামের আগে সাইয়েদ নেই, নামের পরে চৌধুরী।

কাশেম সাহেব ইতিপূর্বে তাঁদের মূল বাড়ি তথা হযরত ওয়াইসী (র)-এর জন্মস্থান বাড়িটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যা বর্তমানে টেংরা দিয়ে ঘেরা অবস্থায় এবং তাতে ক্ষেত করা হচ্ছে তার গোষ্ঠীর অপরাপর সদস্যদের ভাগে পড়া অংশ।

কাশেম সাহেব ও তাঁর গোষ্ঠীর অপরাপর সদস্যরা এবং কয়েকজন প্রতিবেশী দাবী করতেছিলেন—তাদের এই বাড়ি নিকটতম আরোও কতেক বাড়িসহ হাজীপাড়া বলা হয়ে থাকলেও এই বাড়িকে (তাঁদের দাবী মতে হযরত ওয়াইসী (র)-এর বাড়ি ফকিরের বাড়ি বলে থাকে। যেহেতু দীর্ঘযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই বাড়িতে কোনো সময় চুরি-ডাকাতি হয়নি। সেকালে চোররা একাধিকবার প্রবেশ করতে চেয়েও নাকি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

অপরদিকে আমি গ্রন্থকার আমিরাবাদ ইউনিয়নসহ সাতকানিয়া-লোহাগাড়া উপজেলার প্রবীণদের কাছ থেকে জানতে চাই। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক এবং প্রবীণ আলেমগণসহ বয়স্ক, শিক্ষিত, সচেতন প্রায় বেশ কতেক ব্যক্তির মুখোমুখি হই। তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে বলেন যে, তাঁদের শুনামতে হযরত ওয়াইসী (র)-এর জন্মস্থান মল্লিক ছোবহান। মাত্র দেড়শ-দুইশ বছরের আগের ইতিহাস, অতএব একাধিক ব্যক্তির শোনা কথাকে ফেলে দেয়া যায় না।

অতএব আমি গ্রন্থকার মল্লিক ছোবহানকেই হযরত ওয়াইসী (র)-এর জন্মস্থান ধরে নিয়ে অগ্রসর হব।

জন্মকথা

হযরত ওয়াইসী (র)-এর দাদা হযরত সাইয়েদ হারিস আলী (র) উপমহাদেশের রাজধানী দিল্লী থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক ছোবহান গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বর্তমান চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ-আরাকান মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার ভিতর বিখ্যাত তেওয়ারী হাট অবস্থিত। তেওয়ারী হাটের মাত্র কয়েকশ' মিটার দক্ষিণে আরাকান মহাসড়ক সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে বার আউলিয়া ডিগ্রী কলেজের অবস্থান। আরাকান মহাসড়ক ধরে বার আউলিয়া কলেজের সীমানা পার হওয়া মাত্র বাম দিকে তথা পূর্বদিকে একটি ছোট রাস্তা চলে গেছে। ঐ রাস্তা দিয়ে আরাকান মহাসড়ক থেকে মাত্র দুই তিনশ মিটার দূরত্বে হযরত ওয়াইসী (র)-এর জন্মভূমি। গ্রাম মল্লিক ছোবহান হলেও হযরত ওয়াইসী (র)-এর বাড়িকে অনেকে ফকিরের বাড়ি হিসেবে বলাবলি করে থাকে। তবে তার বাড়িসহ আরো কতেক বাড়ি নিয়ে হাজী পাড়া বলে থাকে। আজও কিংবদন্তী আছে—হযরত ওয়াইসী (র)-এর বাড়িতে কোনো সময় চুরি ডাকাতি হয়নি। চোর-ডাকাতরা তথায় প্রকাশ্যে, গোপনে, কৌশলে, সরাসরি প্রবেশ করতে সাহস করত না, যা আজও বহাল আছে।

তথ্য তালাশ ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে জানতে পারি হযরত ওয়াইসী (র)-এর তিন ভ্রাতা, এক বোন। তৎমধ্যে বোনের নাম হযরত সাইয়েদা সালেহা খাতুন ও এক ভ্রাতা হযরত সাইয়েদ সালেহ্ আলী (র)। হযরত সাইয়েদা সালেহা খাতুনের দাম্পত্য জীবন কোথায় গড়েছে তথা শ্বশুরবাড়ি কোথায় তা জানতে পারা যায়নি। অপর তিন ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা হযরত সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং এক ভ্রাতা মায়ানমারে (বার্মায়) হিজরত করেন। অপর ভ্রাতা তথা সাইয়েদ আশরফ আলী চৌধুরীর পিতার ওয়ারিশরা বর্তমান মল্লিক ছোবহান গ্রামে বসবাসরত। তথ্য তালাশে আরো জানতে পারি হযরত সাইয়েদ সালেহ আলী (র) অবিবাহিত ছিলেন। সম্ভবত তিনিই মায়ানমারে হিজরত করেন। যেহেতু এক ভাইয়ের বংশধরেরা বর্তমান মল্লিক ছোবহানের মূল বাড়িতে বসবাস করে আসতেছেন। কাজেই তাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে হযরত ওয়াইসী (র),

হযরত সাইয়েদ সালেহ্ আলী (র)-বাদে অপর ভ্রাতার ওয়ারিশরাই বর্তমানে বসবাসরত ধারণা করা স্বাভাবিক।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর মামার বাড়ি কোথায় তা তথ্য তালাশ করে জানা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর মাতার নাম হযরত সাইয়েদা শাহেদা খাতুন মতান্তরে সাইয়েদা খাতুন। এক নজরে জানতে গেলে—

হযরত সাইয়েদ হারিস আলী (র)

পুত্র : হযরত সাইয়েদ ওয়ারেস আলী (র)

স্ত্রী হযরত সাইয়েদা সায়িদা খাতুন (র)

সন্তান:

১. হযরত সাইয়েদা সালেহা খাতুন (র)

২. সাইয়েদ আশরফ আলীর পিতা

৩. হযরত সাইয়েদ সালেহ আলী (র)

৪. হযরত সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র)

হযরত ওয়াইসী (র)-এর পারিবারিক নানান তথ্য তালাশে গিয়ে জানতে পারি তাঁদের বর্তমান পৈতৃক বাড়িভিটার কয়েকশ' মিটার পূর্ব-উত্তরে এক পুকুরের পূর্ব পাড়ে পারিবারিক কবরস্থান। তথায় তাঁর পিতামাতা শায়িত না হলেও তাঁর দাদা-দাদিসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা চিরনিদ্রায় শায়িত তা অনুমান করা যায়। তাঁদের পরিবারবর্গের মসজিদ হলো বর্তমান বসতবাড়ির মাত্র কয়েকশ মিটার দক্ষিণ-পূর্বে। এই মসজিদটি ১৯৮০-এর দশকে বর্তমানকালের যুগোপযোগী পছন্দ অনুপাতে পুনঃনির্মাণ করা হয়। এই মসজিদটি হাজী পাড়া জামে মসজিদ হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত। এই মসজিদের উত্তরসংলগ্ন ঈদগাহ, তৎসংগলগ্ন গারাংগিয়া হযরত বড় হুজুর (র)-এর নামকরণে শাহ মজিদিয়া মাদ্‌রাসা।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর পৈতৃক বসতভিটাতে তাঁরই ভাতিজা সাইয়েদ আশরফ আলী চৌধুরী-এর ওয়ারিশরা বসবাসরত। সাইয়েদ আশরফ আলী (চৌধুরী)-এর নাতিরা ৬০/৭০ বছরের বৃদ্ধ। জনাব আবুল কাশেম চৌধুরীর বড় ভাই মরহুম মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর ভাগের অংশে হযরত ওয়াইসী (র)-এর জন্মকালীন ঘরটি ছিল। বর্তমানে ঐ ঘর এলাকায় কিছু ক্ষেত ও কয়েকটি সুপারি

গাছ রয়েছে। তার পশ্চিম পার্শ্বে মরহুম মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর সন্তানরা ঘর নির্মাণ করে বসবাস করেতেছেন।

মল্লিক ছোবহান নামের শুদ্ধতা নিয়ে নানান জটিলতা দেখা যায়। ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত মল্লিক ছোবহান গ্রামকে সরকারিভাবে মল্লিক ছোয়াং বলা হচ্ছে বা লেখা হচ্ছে। কিন্তু প্রবীণদের মুখোমুখি থেকে জানাজানি হয়ে আসছে এই গ্রামের এককালে নাম ছিল মূল্কে ছোবহান। কিন্তু আরাকানী মগদের প্রভাবের কারণে ব্রিটিশ আমল থেকে এ গ্রামের নামকরণ করা হয় মল্লিক ছোয়াং।

তবে জনগণের মুখে মুখে এবং জনগণের ব্যক্তিগত লেখালেখিতে, তাদের পক্ষ থেকে ছাপানো কাগজপত্রে, সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রচারপত্রে মল্লিক ছোবহান লিখে আসতেছে।

আব্বাজান

হযরত ওয়াইসী (র)-এর পিতা হযরত সাইয়েদ ওয়ারেস আলী (র) একজন উঁচুমাপের জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি একদিকে যেমনি দেশপ্রেমিক তেমনি স্বাধীনচেতা, তদুপরি একজন আল্লাহ্পাকের ওলী ছিলেন। তিনি হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর মুরীদ ছিলেন। মুসলমানগণের ওপর জুলুম অত্যাচার তাঁকে বারেবারে দাহ করতেছিল। ফলশ্রুতিতে তিনি হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর নেতৃত্বে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর সংস্পর্শে থেকে জিহাদে সময় ব্যয় করাকালীন ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়ার পৌঁছেন এবং তথা হতে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে তাঁর জেহাদি কাফেলা নওশাহরায় পৌঁছে। তথায় গমনের উদ্দেশ্য হলো রণজিত সিংয়ের শাসনাধীন পাঞ্জাবের মজলুম নির্যাতিত মুসলমানদেরকে সাহায্য করা। তথায় রণজিত সিংয়ের জুলুমের প্রতিবাদ করায় হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর কাফেলা রণজিত সিংয়ের মুখোমুখি হয় এবং একটি অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের পাঞ্জাতারের এ যুদ্ধে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর কাফেলায় বহু সূফী ওলামা দরবেশ অংশগ্রহণ করেন এবং এই যুদ্ধে হযরত ওয়াইসী (র)-এর পিতা হযরত ওয়ারেস আলী (র) শহীদ হন। ঐ সময় হযরত সাইয়েদ ওয়ারেস আলী (র)-এর বয়স কত ছিল তা তথ্য তালাশ করেও জানা সম্ভবপর হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, বালাকোটের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে এবং হযরত সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভি (র) শহীদ হন ঐ সালের ১৩ মে, শুক্রবার।

ঢাকা থেকে একজন প্রখ্যাত শিক্ষক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, হযরত ওয়াইসী (র)-এর আব্বাজান হযরত সাইয়েদ ওয়ারেস আলী (র) ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাতারের যুদ্ধে শহীদ হন। এতে করে অত্র গ্রন্থ রচনাকালে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে বারে বারে তথ্য তালাশে মনোনিবেশ করি। তাতে আমি অনেকটা নিশ্চিত যে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে হযরত ওয়াইসী (র)-এর বুজুর্গ

পিতা হযরত সাইয়েদ ওয়ারেস আলী (র) অংশগ্রহণ করেননি। যেহেতু হযরত সাইয়েদ ওয়ারেস আলী (র) ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে মার্দান জেলার পাঞ্জাতারের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলার তখনকার রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সী ছিল বিধায় ব্রিটিশরা শোষণকে আড়াল করে সেবকের নামে যে সকল পদক্ষেপ শুরু করে তন্মধ্যে কলেজে ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা করা অন্যতম। কলকাতা নগরীতে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে চালু হওয়া এ ব্যবস্থা ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত চালু ছিল। তখন ফার্সী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাছাই করে দশজন ব্যক্তিত্বকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে। তন্মধ্যে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষক (প্রফেসর) হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ওয়ারেস আলী। এই সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও ফার্সী বিশারদ ওয়ারেস আলী যে হযরত ওয়াইসী (র)-এর আব্বাজান নন এমন বলা যাবে না।

জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা

হযরত ওয়াইসী (র)-এর জন্মের সন নিয়ে লেখকগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো লেখক তথা গ্রন্থকার জন্মের সন ১৮২৫ বা ১৮২০-২৩ সালের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, অপর লেখক ১৮১৫-১৬ সাল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকাল নিয়ে কোনো লেখক গ্রন্থকারের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ হযরত ওয়াইসী (র) ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর, ১৩০৪ হিজরীর ৮রবিউল আউয়াল ইন্তিকাল করেন। যদি তাঁর জন্ম ১৮১৫ বা ১৬ খ্রিস্টাব্দে ধরা হয় তবে তিনি ৭০ বছর জীবিত ছিলেন। অপরদিকে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ধরলে তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হযরত ওয়াইসী (র) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাঁর পুণ্যবতী মা স্বপ্নে দেখেন যে হযরত খিজির (আ) স্বপ্নে বলতেছেন যে, তাঁর গর্ভে যে পুত্র সন্তান আছে তিনি নবীজী (সা) ও আহলে বাইতের অত্যধিক প্রেমিক হবেন এবং অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ্‌র ওলী হবেন। হযরত ওয়াইসী (র)-এর মহান পিতা হযরত ওয়ারেস আলী (র) একদিন ইশার নামাযের পর মুরাকাবার মাধ্যমে অবগত হন যে, হযরত বড়পীর (র) ও হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র)-এর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পান যে, তাঁর পুত্র হযরত ওয়াইসী (র) একজন নবীপ্রেমিক ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহর ওলী হবেন। আরেকদিন বুজুর্গ পিতা তাহাজ্জুদ নামাযান্তে কুরআন শরীফ পাঠ করাকালীন তাঁকে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (র) ও হযরত খাজা নকশবন্দী বাহাউদ্দীন (র) ইঙ্গিত দেন যে, তাঁর স্ত্রীর গর্ভের শিশু (হযরত ওয়াইসী) (র) একজন আশেকে রসূল ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহর ওলী হবেন।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর পীর সাহেব ও পিতার পীর ভাই হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র) কাশফের মাধ্যমে অবগত হন যে, তাঁরই পীর ভাই হযরত সাইয়েদ ওয়ারেস আলী (র)-এর পুত্র হযরত ওয়াইসী (র) তাঁর প্রতি অশেষ মুহাব্বত রাখবেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হবেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে শিশুদের কুরআন মজীদ পাঠসহ ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ছিল সেকালে। যিনি ধর্মীয় জ্ঞানী হবেন তিনি নিজের বাড়ির পাড়ার শিশুদেরকে কুরআন মজীদ শিক্ষাসহ ধর্মীয় শিক্ষাদান করা রেওয়াজ ছিল। ফলে তখনকার আমলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কমবেশি সবাই পবিত্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াতসহ ন্যূনতম ধর্মীয় জ্ঞান রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

অপরদিকে হযরত ওয়াইসী (র)-এর পরিবার সাইয়েদ বংশের। কাজেই এই পরিবার ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের দিক দিয়ে অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকা স্বাভাবিক।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর বুজুর্গ পিতা যেমনি একজন আলেমেদীন তেমনি দেশপ্রেমিক ও আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর নিজের পরিবারবর্গ, বাড়ি, পাড়ার শিশুদেরকে শিক্ষাদান করা অনেকটা স্বাভাবিক বলা যেতে পারে।

হযরত ওয়াইসী (র)-তাঁর বুজুর্গ পিতার নিকট একাধারে ৭/৮ বছর মতান্তরে ১৩/১৪ বছর শিক্ষালাভ করেছিলেন বলে ধারণা করা যায়। হযরত ওয়াইসী (র) তাঁর বুজুর্গ পিতার পাশাপাশি নিজ জন্মভূমি এলাকায় অন্য কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন কি না তা বারে বারে প্রচেষ্টা চালিয়েও জানতে ব্যর্থ হই।

এখানে উল্লেখ্য, যদি হযরত ওয়াইসী (র) ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তবে ৫/৬ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। অপরদিকে তিনি যদি ১৫ বা ১৬ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন তবে তিনি ১৩/১৪ বছর বয়সে পিতৃহারা হন।

হযরত ওয়াইসী (র) যে প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বুজুর্গ পিতা থেকে গ্রহণ করেন তা সমস্ত গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকার একমত এবং সাথে সাথে বুজুর্গ পিতার ইন্তিকালের পর বুজুর্গ মাতা হযরত ওয়াইসী (র)-কে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বা হিজরতের উদ্দেশ্যে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। এতে করে ধারণা করা যায় যে, হযরত ওয়াইসী (র) ১৮১৫ অথবা ১৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি যদি ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে মাত্র ৪/৫ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। এতে করে মাত্র ৪/৫ বছরের শিশু পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা করার বয়স এবং তাঁর বুজুর্গ মাতা ৪/৫ বছরের শিশুকে নিয়ে সেকালের অনুন্নত প্রযুক্তির জাহাজে সাগর-মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার সাহস করার ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ও অবিশ্বাস্য লাগে। অতএব আমি গ্রন্থকারের ধারণা, তাঁর জন্ম ১৮১৫/১৬ খ্রিস্টাব্দে হবে।

আম্মাজানের ইন্তিকাল

হযরত ওয়াইসী (র)-এর বুজুর্গ পিতা হযরত সাইয়েদ ওয়ারেস আলী (র) পাঞ্জাতারের ধর্মীয় যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ করার পর তাঁর বুজুর্গ মাতার মনের গভীরে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক।

তিনি আরবী, ফার্সী এবং বাংলায় প্রচুর জ্ঞান রাখতেন। অল্প বয়সে পবিত্র কুরআন মজীদ হিফয করেছিলেন। নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া তিনি প্রায় সারা বছরই রোযা রাখতেন। তাঁর বুজুর্গ ও মুজাহিদ স্বামীর মাধ্যমে তিনি তরীকতের কাজ করতেন। আর্থিক অতি স্বচ্ছলতা না থাকলেও তিনি পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি সহমর্মিতার পাশাপাশি দান-দক্ষিণায় হাত-প্রসারিত রাখতেন। তিনি হযরত ওয়াইসী (র)-কে সাথে নিয়ে হজ্জ অথবা হিজরতের উদ্দেশ্যে গমনকালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীর সাগর মোহনায় জাহাজডুবিতে ইন্তিকাল করেন।

সেকালে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পবিত্র আরবভূমি থেকে এই উপমহাদেশে এসে চিরস্থায়ী বসতি স্থাপন করার রেওয়াজ ছিল। তেমনিভাবে আমাদের দেশ থেকে অনেকে অনুন্নত প্রযুক্তির জাহাজে সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে হজ্জ করতে যেতেন। আবার অনেকে খানা-ই-কাবা ও রওযা পাকের আকর্ষণে চিরস্থায়ী চলে যেতেন। তখনকার আমলে রাষ্ট্রীয় আইনের বিধিনিষেধ না থাকায় পবিত্র আরবভূমি থেকে এই অঞ্চলে আসা এবং এই অঞ্চল থেকে আরবভূমি যাওয়ার মধ্যে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না। ফলে এই অঞ্চলের বহু মানুষ পবিত্র, আরবভূমিতে নাগরিকত্বপ্রাপ্ত এবং বংশপরম্পরায় বসবাসরত।

আজও মক্কা মুকাররমায় সৌদি নাগরিকত্বপ্রাপ্ত আমাদের দেশের হজ্জযাত্রী সেবায় মুয়াল্লিমগণের পূর্বপুরুষ এই দেশ থেকে যাওয়া। অর্থাৎ মুয়াল্লিমগণ বর্তমানকালে সৌদি নাগরিক হলেও তাদের পূর্বপুরুষ আমাদের দেশীয়।

বুজুর্গ পিতার ইন্তিকালের পর যুবক হযরত ওয়াইসী (র)-কে তাঁর বুজুর্গ মাতা হজ্জের উদ্দেশ্যে নাকি চিরস্থায়ী হিজরতের উদ্দেশ্যে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন

তাতে গ্রন্থকার ও লেখকগণের মধ্যে বড় ধরনের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। অপরদিকে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় নাকি কলকাতা থেকে জেদ্দা যাওয়ার সময় কলকাতার নিকটে হুগলী নদীর সাগরের মোহনায় জাহাজ ডুবে যায় তা নিয়েও গ্রন্থকার ও লেখকগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

এমনিতে সেকালের জাহাজ অনুন্নত প্রযুক্তির বিধায় সাগরপথে যাতায়াত খুবই ঝুঁকিপূর্ণ থাকত। হুগলি নদীর মোহনায় জাহাজডুবিতে অধিকাংশ যাত্রী ইন্তিকাল করেন। তন্মমধ্যে হযরত ওয়াইসী (র)-এর বুজুর্গ মাতা হযরত সাইয়েদ সায়িদা খাতুন ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ পাকের ওলী ও আশেকে রসূল হযরত ওয়াইসী (র) অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়ে সাঁতরিয়ে স্থলভাগে চলে আসেন।

ভারতে উচ্চশিক্ষা ও জীবন শুরু

হযরত ওয়াইসী (র) যৌবনের প্রারম্ভে পিতা-মাতাকে হারান। অপরদিকে হুগলী নদীর মোহনার স্থলভাগে দাঁড়িয়ে হয়ত ভাবতেছিলেন অত্যন্ত প্রতিকূল যোগাযোগে তিনি কেনইবা চট্টগ্রামের দক্ষিণ মল্লিক ছোবহানে ফিরে আসবেন। তখনো চট্টগ্রাম-কলকাতা রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয়নি। চট্টগ্রাম শহর থেকে মল্লিক ছোবহান যাতায়াত ছিল নদীপথে।

এই রকম কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তিনি হুগলী নদীর মোহনা থেকে কলকাতা শহরে চলে আসেন এবং তালতলায় গৃহ শিক্ষকতার কাজের উসিলায় আশ্রয় লাভ করেন।

যৌবনের প্রারম্ভ থেকে তাঁর কথাবার্তা, চাল-চলনে অতি উন্নত চরিত্র পরিলক্ষিত হতে থাকায় তাঁকে সবাই সমীহ করতে থাকে। কলকাতায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাথে পরিচয় হয় মুর্শিদাবাদের এমদাদুল হোসেন নামক একজন ধর্মীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সাথে। তিনি হযরত ওয়াইসী (র)-কে মুর্শিদাবাদের পুনাশিতে গৃহ শিক্ষকতার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি পুনাশিতে গমন করে কিছুদিন অবস্থান করে পুনরায় কলকাতা ফিরে আসেন।

তবে কোনো কোনো গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকারের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি প্রথমে হুগলী নদীর মোহনা থেকে ফুরফুরাতে পৌঁছেন এবং তথায় জগৎবল্লভপুর থানায় দশাগ্রামের পানভিল্লা মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করতে থাকেন। তিনি হুগলী মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষালাভ করে কৃতিত্বের সাথে পরীক্ষায় পাস করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ওয়াইসী (র) যেমনি অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তেমনি তাঁর জ্ঞানের প্রতিভা সহজে প্রকাশ পেয়ে যেত।

তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, আকাইদ, মানতিক ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। তিনি আরবী ভাষার পাশাপাশি ফারসী ভাষা ও

সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর ওস্তাদগণের মধ্যে হযরত সূফী গোলাম কাদের (র) অন্যতম বিখ্যাত আলিম ও কামিল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি হেকিমী শিক্ষায়ও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

তিনি কলকাতা আগমন করে কলকাতা আলিয়া মাদরাসাসহ আরো দুই-একটি মাদ্রাসায় কিছুদিন খণ্ডকালীন শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আরবী ও ফার্সির পাশাপাশি তিনি উর্দু, বাংলা, ইংরেজী ভাষার ওপর দখল রাখতেন। তবে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে উর্দুর চেয়ে ফার্সির ব্যবহারটা অত্যধিক ছিল। শিশুকাল থেকে তাঁর ফার্সি ভাষার প্রতি খুবই ঝোঁক ছিল। এতে করে ফার্সি ভাষায় তিনি ছোটকাল থেকে কবিতা লিখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর হস্তলিপি খুবই সুন্দর ছিল এবং তিনি স্বহস্তে পবিত্র কুরআন মজীদের অনুলিপি করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়।

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে হযরত ওয়াইসী (র) কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রেশন বিভাগের প্রধান রেজিস্ট্রার-এর দায়িত্বে ছিলেন।

হযরত ওয়াইসী (র) কিছুদিন এই পেশায় চাকুরিরত ছিলেন। অতঃপর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে ব্রিটিশ সরকার হায়দ্রাবাদ থেকে মেটিয়াবুরুজে যখন অবরুদ্ধ করে রাখে তখন তিনি তাঁর একান্ত সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নবাব নিজে একজন কবি ছিলেন বিধায় অন্যান্য বিখ্যাত কবিগণের সাথে তাঁর ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। হযরত ওয়াইসী (র) একজন ফার্সি কবি হওয়ায় নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত করতেন। হযরত ওয়াইসী (র) ও তাঁর মহান পিতার অনুকরণে দেশপ্রেমিক ছিলেন। ফলে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ চাকুরি ত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীতে একটি পলিটিকেল পেনশন অফিসে সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত ওয়াইসী (র) দেশপ্রেমিক ছিলেন বিধায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বন্দী নবাবের অধীনে কাজ করতে তাঁর মনকে তাড়িত করেছিল। এতে এও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দেশপ্রেমিকের সাথে সাথে অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। টিপু সুলতানের পরিবারবর্গকে যখন কলিকাতায় কালীগঞ্জে বন্দী করে আনা হয় তখনো তিনি ইংরেজের দাপটকে উপেক্ষা করে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওয়াইসী (র) মূলত অর্থের প্রয়োজনে চাকুরি প্রত্যাশী ছিলেন না বিধায় হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ চাকুরি ত্যাগ করে তিনি মেটিয়া বুরুজে নবাব টিপু সুলতানের পরিবারসহ বিভিন্ন স্থানে অবাধে সাহসের সাথে যাতায়াত করতেন দেশপ্রেমে তাড়িত হয়ে।

দাম্পত্য জীবন

উপমহাদেশের ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত জেলা মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ জেলা স্বনামে বিশ্বের বুকে একটি বিখ্যাত নাম। এককালে বিশ্বের বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যেত না। সেই ব্রিটিশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় মুর্শিদাবাদের নবাবকে পরাজিত ও হত্যা করে এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের যাত্রা শুরু করে। মুর্শিদকুলি খানের নামকরণে মুর্শিদাবাদ।

সেই মুর্শিদাবাদের পুনাশি গ্রামের জমিদার বংশের খন্দকার নেজাবত হোসেনের একান্ত আগ্রহে নেজাবত হোসেনের আত্মীয়ের কন্যা হযরত ফাতেমা খাতুনের সাথে পুনাশি গ্রামে তাঁর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুনের পিত্রালয় মুর্শিদাবাদ জেলার ঘাড়েরা গ্রামে, যা অনেকটা পুনাশি গ্রামের নিকটে। কিন্তু মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুনের নানার বাড়ি পুনাশি গ্রামে। বিবাহকালে হযরত মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুন পিতৃহীনা ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা জমিদার ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। হযরত মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুনের আর কোনো ভাই-বোন ছিল না। থাকলেও ছোটকালে ইন্তেকাল করে গেছে। খন্দকার নেজাবত-এর নিকটাত্মীয়ের কন্যা বিধায় তাঁরই প্রচেষ্টায় পুনাশিতে প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করে একটি পাকা দালান, পুকুর, বাগান ইত্যাদি ব্যবস্থা করে দেন। পুনাশিতে কিছুকাল অবস্থান করলেও হযরত ওয়াইসী (র) দাম্পত্য জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান কলকাতা নগরীতে।

হযরত ফাতেমা বেগম অত্যন্ত নম্র ভদ্র নারী ছিলেন। তিনি কখনো স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করেননি। বছরের অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। তিনিও তাঁর শাশুড়ী আম্মাজানের মতো পাড়া, প্রতিবেশীদের প্রতি সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখতেন।

হযরত ওয়াইসী (র) তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর পরিবারকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং কড়েয়া রোডে অবস্থান করেন। তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রী হযরত ফাতেমা খাতুন খুবই সহজ সরল ছিলেন। তিনি জমিদারের কন্যা হয়েও স্বামীর অত্যন্ত অনুগত থাকতেন।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রী মুর্শিদাবাদের পুনাশিতে ফিরে যান। কিন্তু তিনি পুনাশিতে অবস্থান না করে তাঁর পুণ্যবতী কন্যা সাইয়েদা জোহরা খাতুনের শাহপুরস্থ শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন এবং তথায় তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর পবিত্র মরদেহ শাহপুর থেকে পুনাশিতে নিয়ে আসা হয় এবং দীঘির পাড় নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

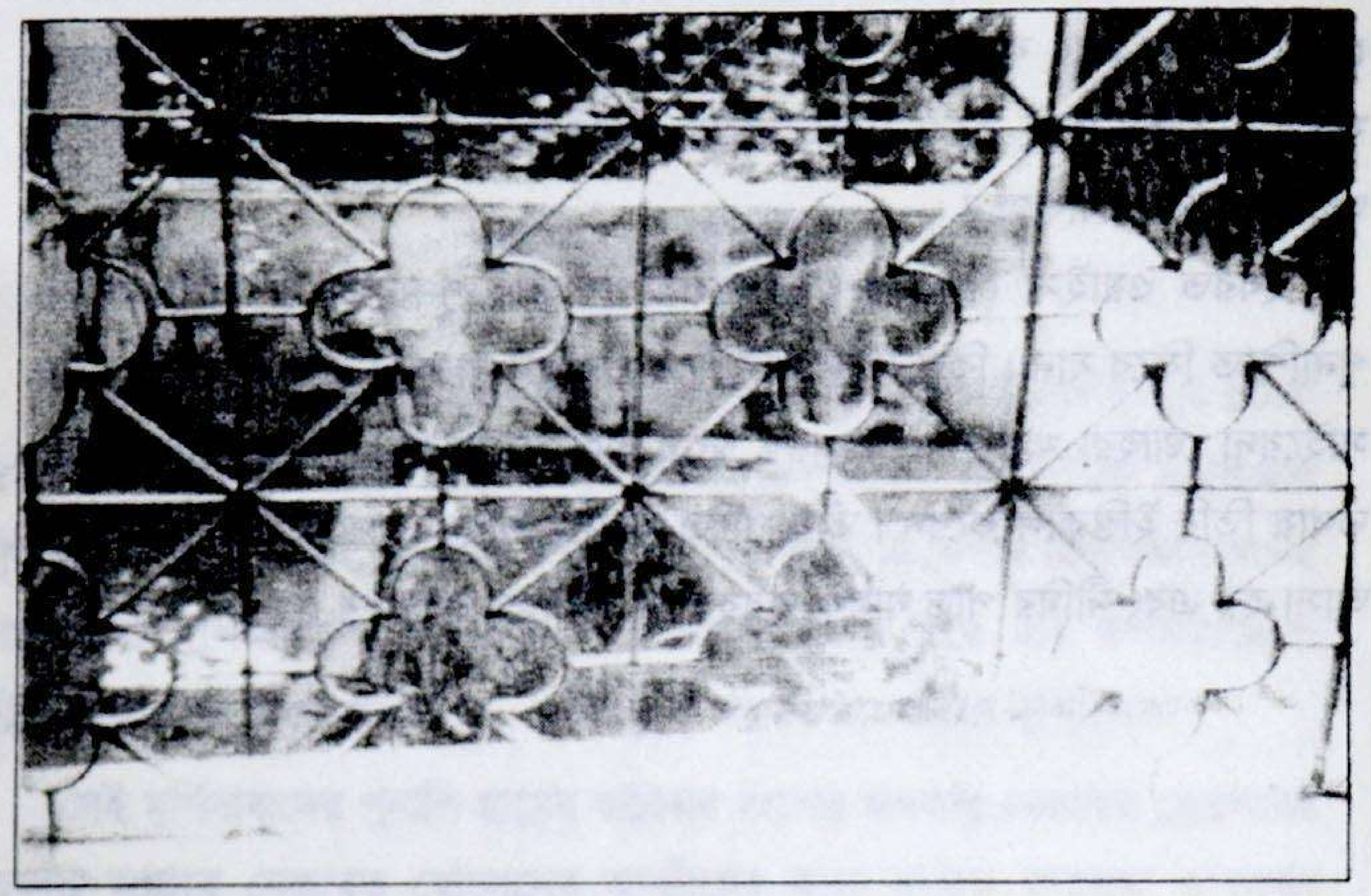

হযরত ওয়াইসী (র)-এর পীর সাহেব হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর মাযার, মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম।

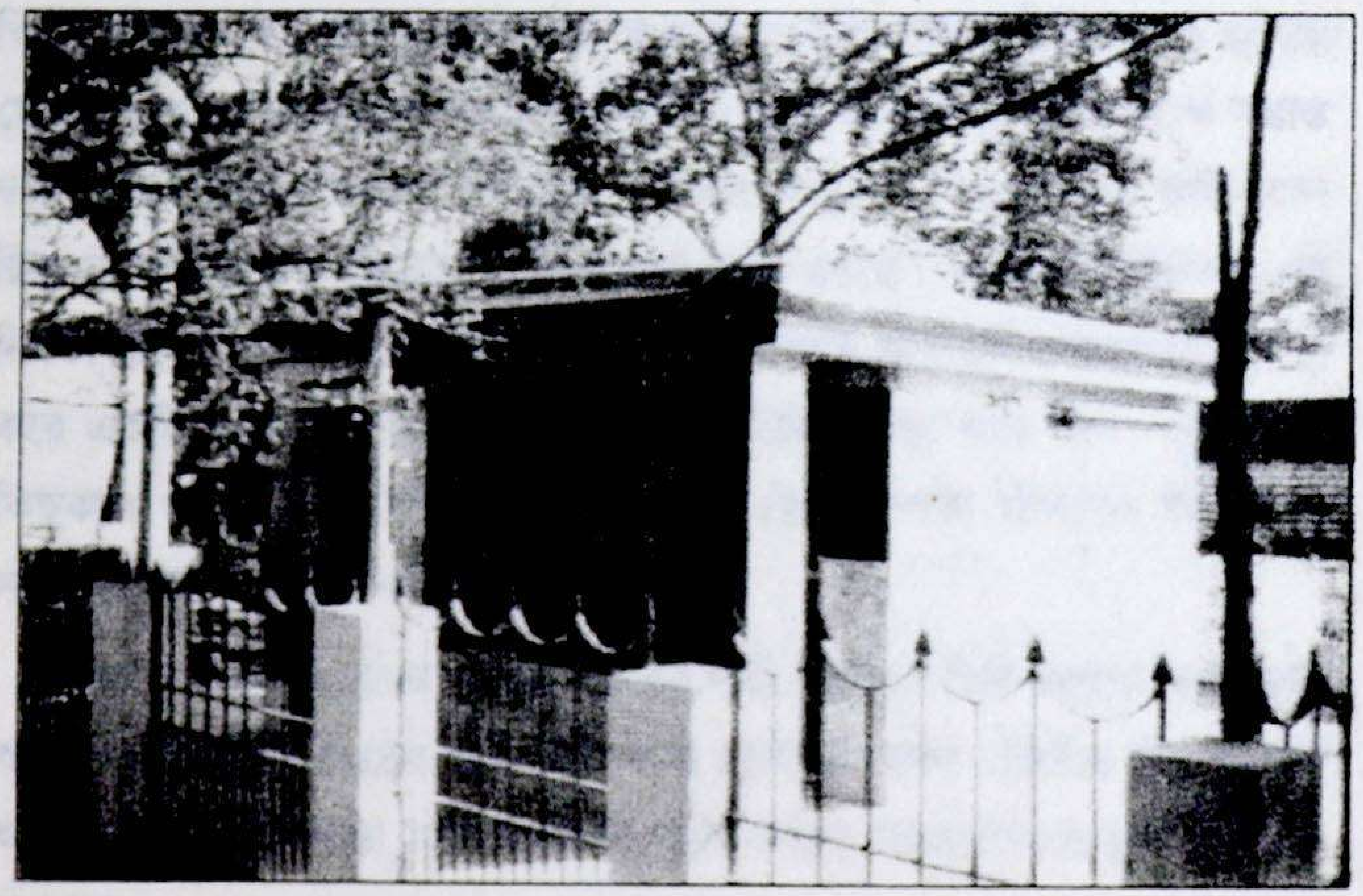

কলকাতার মানিক তলায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর মাযার।

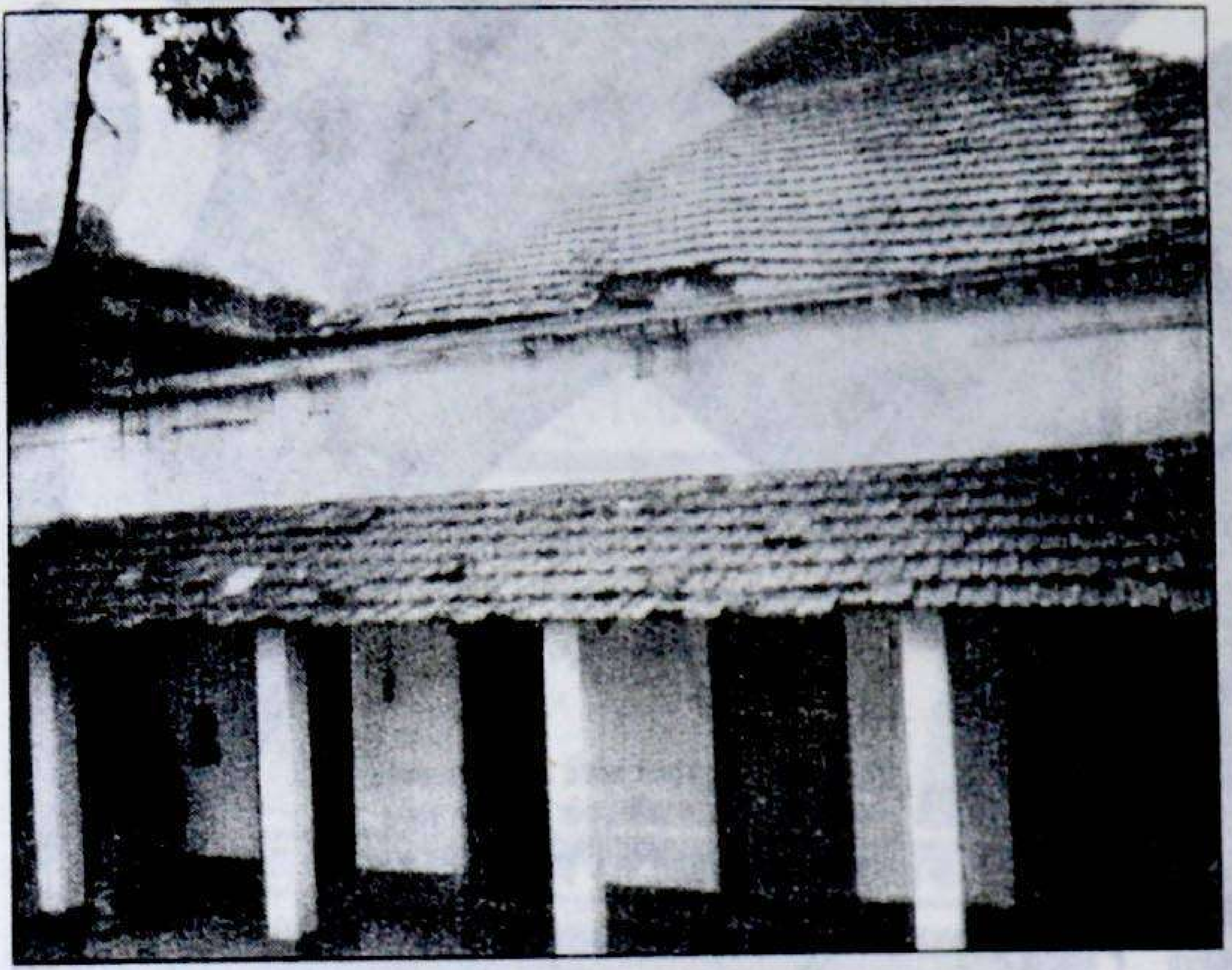

কলকাতার মানিকতলায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর মাযার সংলগ্ন মসজিদ।

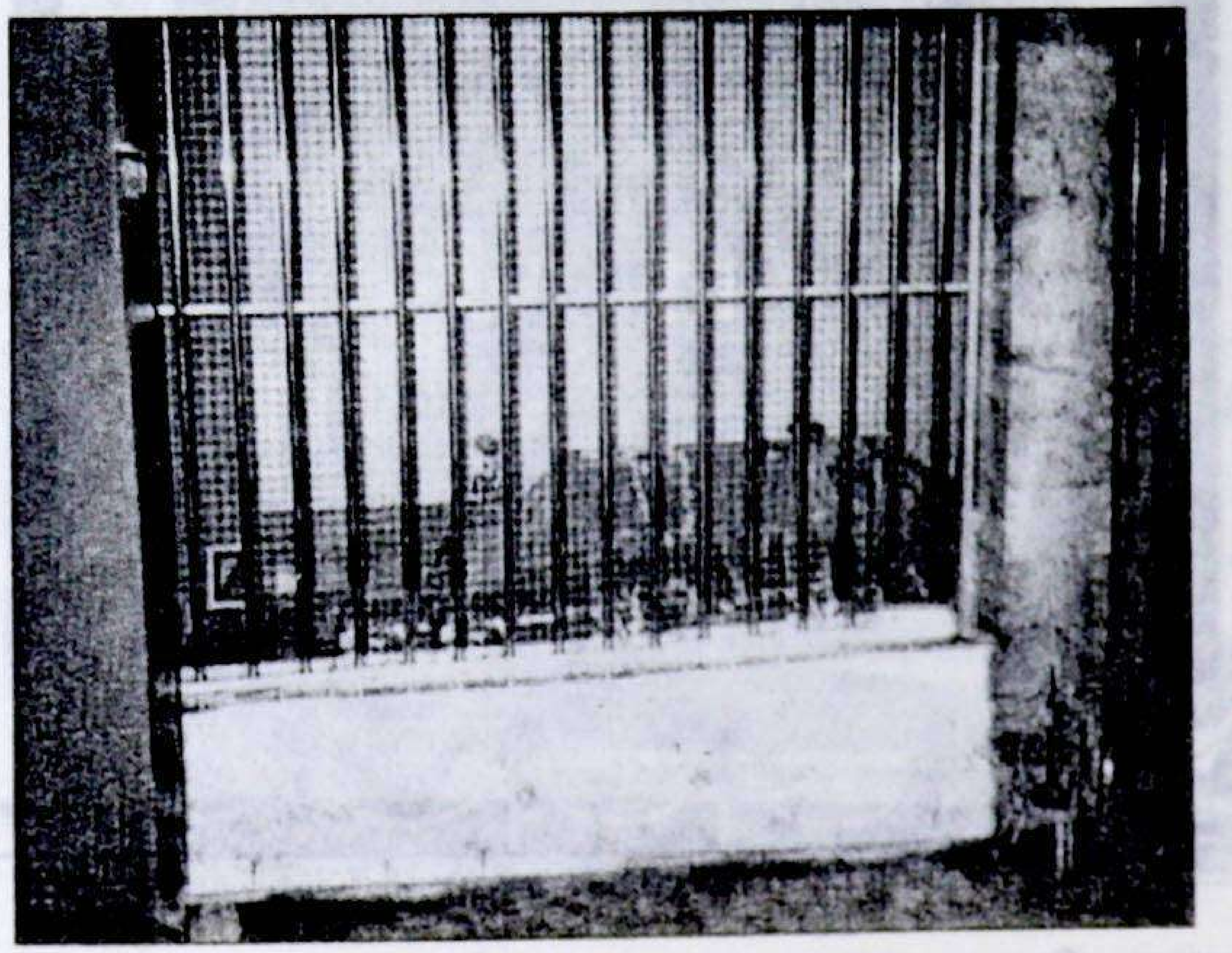

কলকাতার মানিকতলায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর মাযারের ভিতরের অংশ।

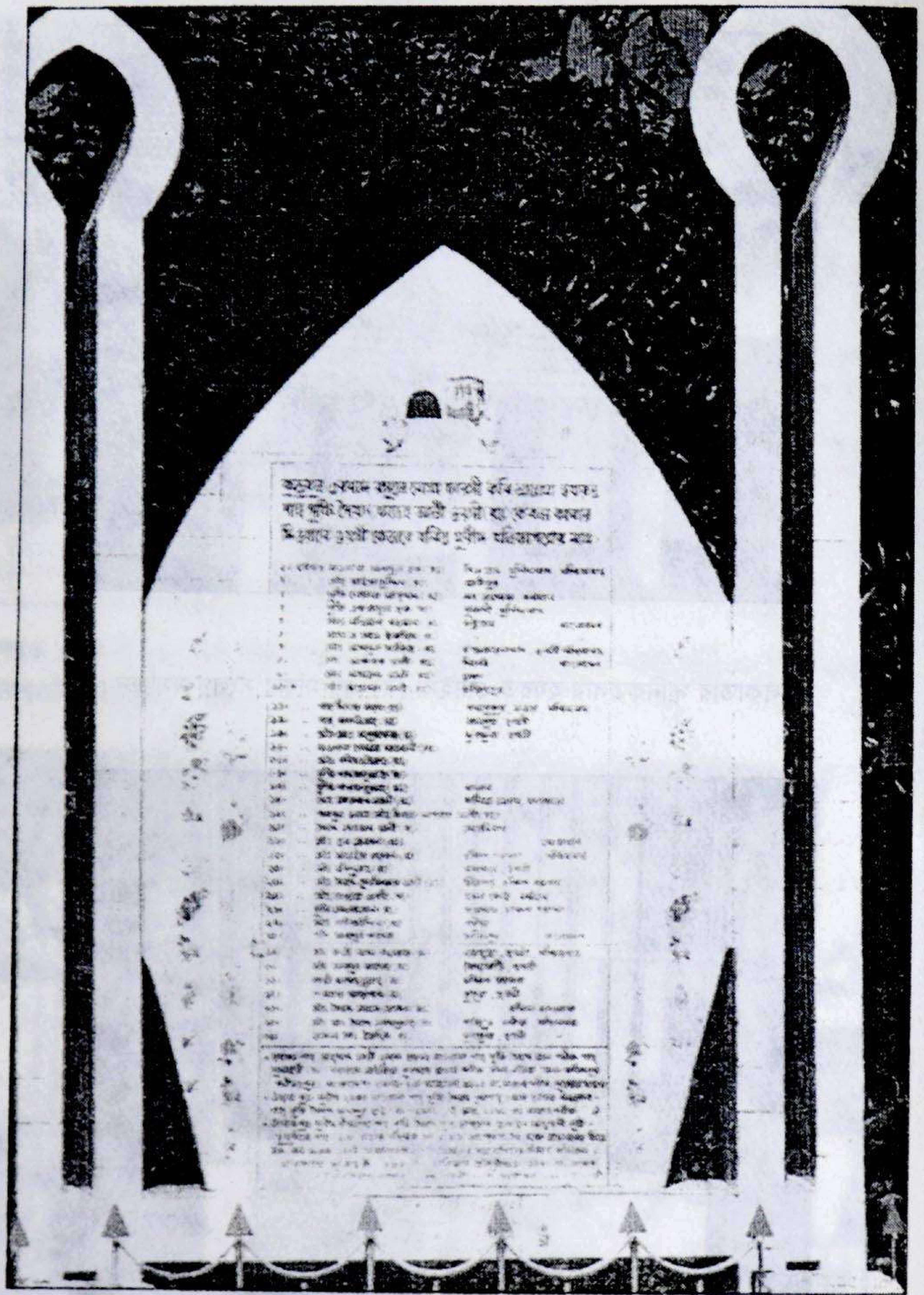

কলকাতার মানিকতলায় মাযার সংলগ্ন হযরত ওয়াইসী (র)-এর স্বনামধন্য ৩৫জন খলিফার নামফলক।

কলকাতার মানিকতলায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর মাযার ও কবরস্থান এলাকায় প্রবেশ দ্বার।

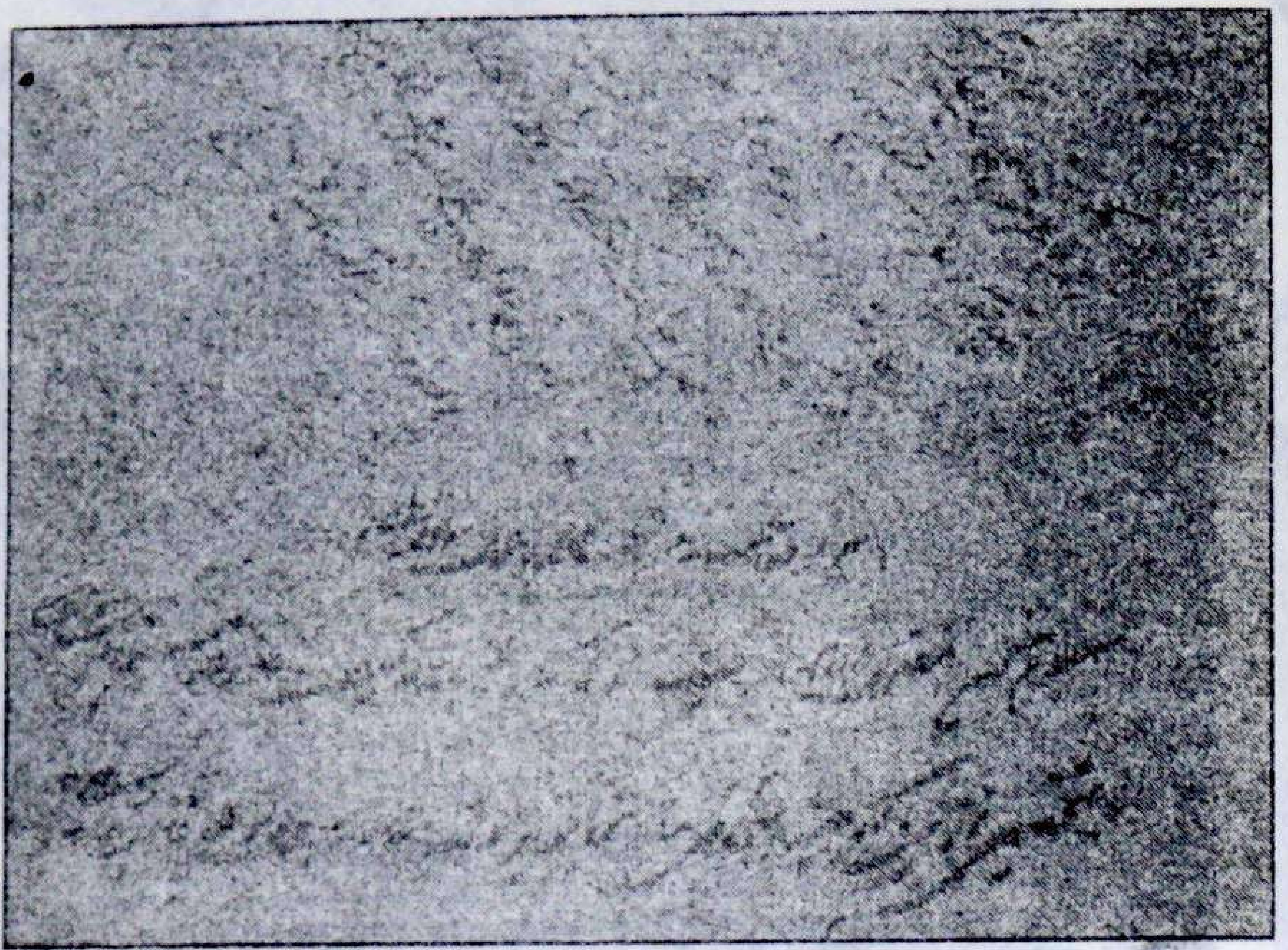

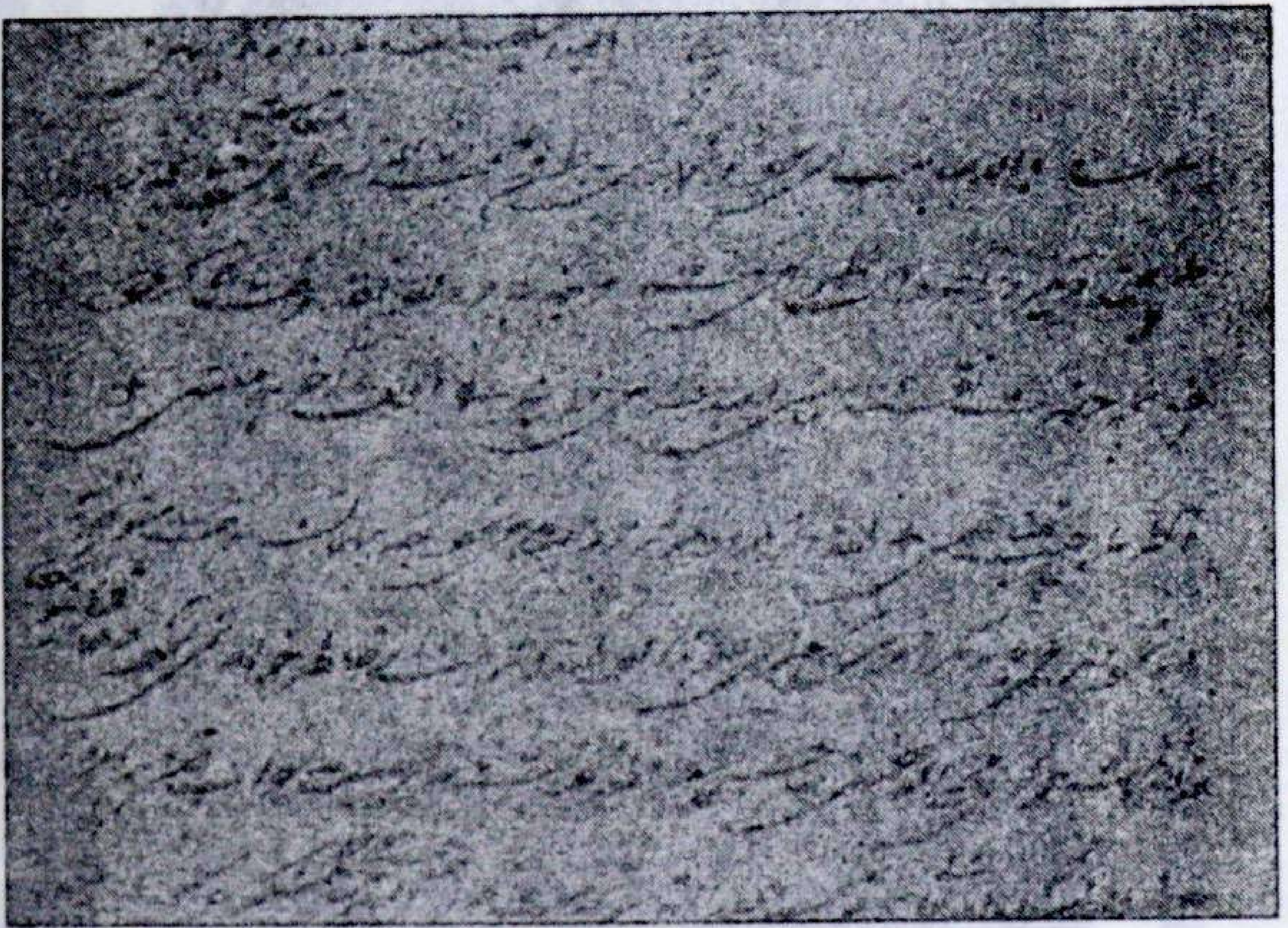

হযরত ওয়াইসী (র)-এর নিজ হাতের লেখা দুটি পত্র।

তরীকত জীবনে পদার্পণ

হযরত ওয়াইসী (র) ছোটকাল থেকে তাঁর বুজুর্গ পিতার সাহচর্যে থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর ভেতর মহান আল্লাহ্ পাকের ঐশ্বরিক শক্তির দোলা দিতে থাকে। তাঁর ভিতর যেমনি ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান তেমনি নবীপ্রেমের সাথে সাথে দেশাত্মবোধও সমান্তরালে কাজ করে যাচ্ছিল। এমনি এক সময়ে কলকাতা নগরীতে সাক্ষাৎ লাভ করেন হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর। এরই মধ্যে হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র) ও তাঁর পীর ভাই ও শহীদ হযরত সাইয়েদ ওয়ারেস আলী (র)-এর সুযোগ্য সন্তান হযরত ওয়াইসী (র)-এর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং বায়াত গ্রহণ করবে তা তাঁর জানা হয়ে যায়। হযরত সূফী নিজামপুরী (র)-কে হযরত বড়পীর (র) কস্‌ফের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন যে, তাঁরই ভক্ত ও শহীদ ওয়ারেস আলী (র)-এর পুত্র নবীপ্রেমিক আহলে বাইত প্রেমিক।

তিনি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখেন, হযরত নিজামপুরী (র) যাতে তা অনুসরণ করেন। অপরদিকে সূফী নিজামপুরী (র) পরপর চার খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে ইঙ্গিতপ্রাপ্ত হন নবীপ্রেমিক হযরত ওয়াইসী (র) যে তাঁর হাতে মুরীদ হতে যাচ্ছেন। হযরত নিজামপুরী (র) কলকাতার কলিন স্ট্রীট-এর মুন্সি গোলাম রহমান মসজিদ সংলগ্ন কক্ষে অবস্থান করতেন। এ সময় নূরানী চেহারা, সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, ঘন দাড়ি, কোমল স্বভাব ও সুমিষ্ট কথাবার্তার এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হলেন হযরত মাওলানা সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (র)। হযরত নিজামপুরী (র) তাঁকে মুরীদ করে নেন এবং তাঁর যোগ্যতা হযরত নিজামপুরী (র)-এর জানা না থাকার কথা নয়। অতএব উচ্চ পর্যায়ের সবক প্রদান শুরু করেন। হযরত সূফী নিজামপুরী (র) দীর্ঘদিন যাবৎ কলকাতা অবস্থান করায় হযরত ওয়াইসী (র) নিজ পীরের সংস্পর্শে থেকে দ্রুত আধ্যাত্মিক তালীম লাভ করার সুযোগ পান। এতে করে অল্পদিনের ভিতর কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়াসহ সমস্ত তরীকতের উচ্চ মাকাম লাভ করেন এবং

পরবর্তীতে খিলাফত লাভ করেন। তিনি নিজ পীরের দরবারে থাকাকালীন নিজেকে পীরের প্রতি বিলিয়ে দিয়েছিলেন। পীরের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

হযরত ওয়াইসী (র) খিলাফতপ্রাপ্তির পর ক্রমশ সংসার থেকে দূরে এসে আল্লাহ্ ও নবীর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর বেতনের উপার্জিত টাকার অধিকাংশ অংশ মানুষকে খাওয়ানোসহ পরোপকারে ব্যয় করতেন।

তিনি চাকরি ও তবলীগে তরীকতের কাজ সমান্তরালে চালানো সম্ভবের বাইরে মনে করায় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারী চাকরি ত্যাগ করেন।

তাঁর কাশফ-কারামত, নবীপ্রেম, উন্নত চরিত্রের কথা চতুর্দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এতে করে চতুর্দিক থেকে বহু বড় বড় আলিম জ্ঞানীগুণীরা তাঁর সাহচর্য লাভে তাঁর কাছে মুরীদ হতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে।

তিনি প্রায় ২০ বছর যাবৎ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে শরীয়ত ও তরীকতের তালিম দিতে থাকেন।

নবীপ্রেম ও দিওয়ানে ওয়াইসী

হযরত ওয়াইসী (র) একজন উঁচু মাপের আলিম এবং সাথে সাথে আরবী, ফার্সি, উর্দু, ইংরেজী, বাংলাভাষা বিশারদ ছিলেন। কিন্তু ফার্সি ভাষায় তিনি একজন অতি উচ্চ মাপের জ্ঞানী ও কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার ব্যবহৃত ছদ্মনাম ছিল ওয়াইসী। তিনি যেমন কঠোর সুন্নতের পাবন্দ ছিলেন তেমনি শরীয়ত ও তরীকতের পাশাপাশি নবীপ্রেমে দিওয়ানা ছিলেন। হযরত ওয়ায়েস করনি (র)-এর নবীপ্রেম ও হযরত ওয়াইসী (র)-এর নবীপ্রেম অনেকাংশে মিলে যায়। নবীর ইশ্‌ক ও মুহাব্বতে তাঁর কলম থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিতো হতো। তাঁর ইশ্‌ক ও মুহাব্বতের স্বরূপ ১৭৯টি গযল ২৩টি কাসীদা উপমহাদেশ পেরিয়ে বিশ্বের বুকে সাড়া জাগায়।

এখানে উল্লেখ্য, হযরত ওয়াইসী (র) জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর এসব গযল-কাসীদা লেখাগুলো তাঁরই পুণ্যবতী কন্যা সাইয়েদা জোহরা খাতুনকে অর্পণ করে যান। সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুম তা তাঁর পুণ্যবতী মা সাইয়েদা জোহরা খাতুন থেকে সংগ্রহ করেন এবং হযরত ওয়াইসী (র)-এর ইন্তেকালের ১২ বছর পর ১৮৯৮ সালে দিওয়ানে ওয়াইসী শীর্ষক নামকরণে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

এই বিখ্যাত গ্রন্থ কলকাতার সৌদিয়া প্রেস থেকে ২০৮ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯২২ সালে কলকাতা থেকে ২য় সংস্করণ এবং সাথে সাথে কানপুর থেকেও পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। হাজী আবদুল কাইয়ুম-এর সহযোগিতায় ১৯৩৫ সালে কানপুর থেকে ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারী জেনারেল ড. শেখ আহামদ আলী কলকাতা থেকে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯৯৯ সালে।

মূলত তিনি বাঙালি ও চট্টগ্রামের অধিবাসী হয়েও তাঁর কাছে বাংলা, উর্দু, ইংরেজীর চেয়ে আরবী ও ফার্সি ভাষায় অত্যধিক দখল ছিল। অবশ্য তখন রাষ্ট্রীয়ভাবেও ফার্সি ভাষার আধিক্য ছিল। অপরদিকে নবীপ্রেম, ভালোবাসা ফার্সি

ভাষায় যেভাবে আবেগের সাথে ফোটানো যাবে তা বাংলায়, ইংরেজীতে যাবে বলে মনে হয় না।

দিওয়ানে ওয়াইসীর ফার্সি কাব্যগ্রন্থকে ইরানের হাফেয সিরাজী, শেখ শাদী (র) সহ বিশ্ববিখ্যাত ফার্সি কবিগণের রচনা থেকে কোনো অংশে কম বলা যাবে না।

তাঁর কেবলমাত্র একটি গযল ভারতবর্ষে বাংলার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন এবং আরো কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তি আংশিক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়। অতঃপর অনেকেই অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গযলের অন্তর্নিহিত অর্থ তথা অলৌকিক শক্তি এতই অন্তর্ভেদী ছিল যে তা বাংলায় অনুবাদে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর নাতি এডভোকেট সাইয়েদ জানে আলম (র) দিওয়ানে ওয়াইসীর ফার্সি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে যান। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তা প্রকাশিত হয়নি। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ব্যারিস্টার সাইয়েদ শাহিদ আলমের সহযোগিতায় ২০০১ সালে হযরত ওয়াইসী (র)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা সূফী আহমদ আলী সুরেশ্বরী (র)-এর নাতি ও সুরেশ্বর দরবারের পীর সাহেব হযরত আলহাজ্ব সাইয়েদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদী নূরী সাহেব প্রকাশ করেন।

হযরত ওয়াইসী (র)-কে সারাটা জীবন শরীয়ত ও তরীকতের খেদমত, দাম্পত্য জীবন, মানবপ্রেম, দেশদরদ এসবের সমান্তরালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বত দিনরাত দাহ করে চলত। তিনি একজন নবীপ্রেমিক এবং নবীপ্রেমে দিওয়ানা তা তাঁর কাসীদা ও জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে অনায়াসে বুঝা যায়। নবী প্রেমিকের অন্যতম লক্ষণ হলো সুন্নতের পাবন্দ। তিনি কঠোর ও কড়া সুন্নতের পাবন্দ ছিলেন। তাঁর মুখে সবসময় নবীজীর শানে ফার্সির শ্লোক থাকত। দিনে, রাতে, ঘুমে, তন্দ্রায়, মুরাকাবায়, জাগ্রত অবস্থায় তিনি নবীজীর মুলাকাত হাসিলের গৌরবান্বিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, একবার তিনি নবীজীর মুলাকাতের প্রত্যাশী হয়ে জিদ ধরে বসেন। এই জিদের ওপর সময় ক্ষেপণ হচ্ছিল কিন্তু তাঁর কাঙ্ক্ষিত মুলাকাত পাচ্ছিলেন না। অপরদিকে হযরত ওয়াইসী (র)-ও অনড়। তিনি নবীজীর

মুলাকাতে দৃঢ় প্রত্যাশী। অবশেষে নবীজীর মুলাকাত লাভে গৌরবান্বিত হন। শুধু তাই নয় যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় তাঁর ইচ্ছায় নবীজী (সা) মুলাকাত দেবেন বলে স্নেহের আশেককে আশ্বস্ত করেন।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর ওপর গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকারগণ উল্লেখ করে গেছেন নবীজীর সাহাবীগণ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নবীজী (সা)-এর প্রেম প্রগাঢ় ভালোবাসা, শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে হযরত ওয়াইসী (র) অধিক সংখ্যক কাসীদা, গযল রচনা করেছেন।

বিশেষ করে হযরত হাসান ইবনে সাবিত (র), হযরত কাব ইবনে যোহায়ের (র), হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (র) (৬৭২ হিজরী), হযরত শেখ সাদী (র) (৬৯১ হিজরী), হযরত শরফুদ্দীন বুসিরী (র) (১২৯৬ ইংরেজী), হযরত আমীর খসরু (র) (১৩২৫ ইংরেজী), হযরত হাফিয সিরাজী (র) (১৩৯০ ইংরেজী), হযরত মির্জা মুহাম্মদ কুদসী (র) (১৪৪৬ ইংরেজী), হযরত আবুল ফজল ফাইজী (র) (১৫৯৫ ইংরেজী), হযরত আল্লামা জামী (র) (১৪৯২ ইংরেজী), হযরত মির্জা গালিব (র) (১৮৬৯ ইংরেজী), হযরত আহমদ শাওকী (র) (১৯৩২ ইংরেজী), হযরত আল্লামা ইকবাল (র) (১৯৩৮ ইংরেজী), হযরত আল্লামা হালি (র) (১৯৪৪ ইংরেজী) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৭৫ ইংরেজী) প্রমুখ নবীজী (সা)-এর শানে কাসীদা, গযল রচনা করে গেছেন।

কিন্তু কেউই হযরত ওয়াইসী (র)-এর মতো এতো অধিক কবিতা নবীজী (সা)-এর ওপর রচনা করেননি। এতে করে বিশ্বের বুকে "দিওয়ানে ওয়াইসী" যে নবীজী (সা)-এর শানের ওপর একটি অতুলনীয় গ্রন্থ তা সহজেই বুঝে নেওয়া যায়।

জীবনধারা

হযরত ওয়াইসী (র)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনধারার ওপর আলোকপাত করা সম্ভবের বাইরে বলে মনে করি। চট্টগ্রাম থেকে তাঁর ওপর কোনো গ্রন্থ বের হয়েছে বলে আমার জানা নেই। হয়ত প্রবন্ধ থাকতে পারে। আমি নগণ্য গ্রন্থকারের আমাদের দেশের সংবাদপত্রে এই মহান ওলী ও আশেকে রসূলকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখার সৌভাগ্য হয়েছে। চট্টগ্রাম পেরিয়ে বাংলাদেশে অন্য কোনো স্থান থেকে তাঁর জীবন প্রবাহ নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তাও জানতে পারিনি। তবে ভারত থেকে তাঁর ওপর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন ভাষায়।

হযরত ওয়াইসী (র) ইন্তেকাল করেছেন আজ থেকে ১২০ বছর আগে। তাঁর ইন্তেকালের পরপর তাঁর জীবনের ওপর গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায় সাম্প্রতিককালের গ্রন্থগুলো পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা সম্ভবের বাইরে বলে মনে করি। ভারত থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ পর্যালোচনা করে যতটুকু বুঝতে পারি, হযরত ওয়াইসী (র) দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। তাঁর কাছে প্রতিদিন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, সাধারণ শিক্ষিতসহ অসংখ্য দর্শনার্থীর সমাগম ঘটত।

কিন্তু তাদেরকে নিজস্ব চাকরির টাকা থেকে মেহমানদারী করা বাদে উল্টো হাদিয়া তোহফার কোনো প্রশ্ন ছিল না। তিনি কাজের লোকদেরকে তাঁর সমমর্যাদা দিতেন। করতেন দয়া ও ভালোবাসা। তিনি অত্যধিক সাহসী ছিলেন বিধায় কাউকে পরোয়া করতেন না। তিনি যে কোনো অসুস্থ লোকজনকে দেখতে যেতেন এবং কারো ইন্তেকালে জানাযায় শরিক হতে তৎপর থাকতেন।

তাঁর কাছে যে হারে গরীব, দরিদ্রের পাশাপাশি ধনী, নবাব, বড় বড় ব্যবসায়ীরা সোহবত রাখতেন, সে হারে তিনি ইচ্ছা করলে যথেষ্ট অর্থ-সম্পদের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু এই দুনিয়াবিমুখ মহান আল্লাহ্র ওলী ও আশেকে রসূল দুনিয়াবী লোভ লালসা, ধন, সম্পদের প্রতি আকর্ষণকে পদদলিত করে গেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ ৩৫ জন বিখ্যাত উত্তরসূরি। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে উপমহাদেশের

ধর্মীয় ও দুনিয়াবী উভয় স্তরের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বগণ তাঁর সংস্পর্শ লাভে উদগ্রীব থাকত। শহীদ টিপু সুলতানের পরিবারের সাথে যাওয়া-আসা ও সুসম্পর্ক এবং সাথে সাথে উপমহাদেশের বহু নবাব পরিবারের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল দেশাত্মবোধের পাশাপাশি দেশ ও মানবজাতির কল্যাণে। তিনি মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানে সফর করে থাকলেও তাঁর মূল অবস্থান কলকাতায় ছিল।

তিনি শরীয়তের কঠোর পাবন্দ ছিলেন। তাঁর শ্রদ্ধাভাজন পীর সাহেব হযরত নিজামপুরী (র) ও দাদা পীর হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (র) কঠোর শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন। শরীয়তের প্রতি কঠোরতাকে উপমহাদেশের অনেকে নজদী আকীদা বলে ভুল বুঝতেন।

মূলত ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী শেখ আহমদ ফারুকী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই সিলসিলার প্রত্যেক পীর মুরীদ শরীয়তের কঠোর পাবন্দ। তাঁরা শরীয়তকে ঠিক রেখে তরীকতের কাজ আঞ্জাম দিয়ে আধ্যাত্মিক সাগরে বিচরণ করে অতি উচ্চাঙ্গে পৌঁছে যান। যুগে যুগে প্রত্যেক কিছুতে পরিবর্তন হয়, ঢুকে ভণ্ডামি। অতএব যারা শরীয়তকে অবহেলা করে তরীকত ঠিক রাখতে চায় তাদেরকে ভণ্ড বাদে আর কি বলা যেতে পারে। এসব ভণ্ডদের কারণে ওয়াইসী সিলসিলাকে ভুল বুঝা যাবে না।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর নিকট ধনী, গরীব, জ্ঞানী, অজ্ঞানী যে কেউ সাক্ষাৎ লাভের সাথে সাথে তিনি যখন-তখন চিনতে পারতেন তিনি কোনো ধরনের লোক। ভালো নাকি দুষ্ট, সৎ নাকি অসৎ, হক্কানী নাকি ভণ্ড, হালালে থাকে নাকি হারাম খায়-তা তিনি দৃষ্টি দেওয়ার সাথে সাথে বুঝতে পারতেন।

তিনি প্রতি শুক্রবার সকালে তাঁর তওফিক মতো রান্না তৈরী করে মানবের পাশাপাশি পশু পাখিদেরও খাওয়াতেন। তিনি ইচ্ছা করলে কলকাতা নগরীতে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারতেন; কিন্তু তা তিনি করেননি। তিনি দুনিয়াতে কোনো সহায়-সম্পদ রেখে যাননি। শুধুমাত্র তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীর পৈতৃক সহায়তায় মুর্শিদাবাদের পুনাশিতে ছোট্ট একটি বাড়ি, একটি পুকুর ও এক খণ্ড জমি বাদে। ঐসব কিছু তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক সূত্রেপ্রাপ্ত বলা চলে। তিনি মানবসেবার পাশাপাশি রাতদিন মুরাকাবা ও ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যয় করতেন।

তিনি দুধের তৈরী খাদ্য এবং ফলফলাদি বেশি পছন্দ করতেন। লাউ, সবজিও ঘনঘন খেতেন। পান ছিল তাঁর প্রিয়। তিনি তাঁর কোনো মুরীদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করতেন না। বিশেষ অবস্থায় দাওয়াত গ্রহণ করতেন।

মহীশুরের শাহজাদা গোলাম মোহাম্মদের পরিবারের আর্থিক সহায়তায় পবিত্র কুরআন মজীদসহ অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ঐসব মহান গ্রন্থ হযরত ওয়াইসী (র) দ্বারা প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সাথে গোলকুণ্ডার নবাব পরিবারের সাথে হযরত ওয়াইসী (র)-এর সম্পর্ক ছিল। শাহজাদা সুলতান রহিম উদ্দিন আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ, নবাব আবদুস সাত্তারসহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও পরিবার হযরত ওয়াইসী (র)-কে অত্যধিক সম্মান করতেন এবং তাঁর উপদেশ ও দিকনির্দেশনা মেনে নিয়ে চলতেন।

কলকাতার ধর্মতলা টিপু সুলতান মসজিদ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডস্থ মসজিদের ভিত্তি প্রদান করেন হযরত ওয়াইসী (র)। তখন ঐসব অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। টিপু সুলতান মসজিদের ওয়াক্‌ফনামা তিনিই লিখেছিলেন।

কলকাতাসহ অবিভক্ত বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে তিনি সমস্ত মুসলমানগণের পাশাপাশি হিন্দু-বৌদ্ধদের কাছেও সমান্তরালে সম্মানের পাত্র ছিলেন। এমনকি ব্রিটিশের দোর্দণ্ড প্রতাপের সময়েও সাদা চামড়ার ব্রিটিশরা হযরত ওয়াইসী (র)-কে ভয় করত, সমীহ করত। যদিওবা তিনি ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতার পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতেন। অর্থাৎ কলকাতা পেরিয়ে সমস্ত বাংলা, আসাম ও বিহার অঞ্চলে সর্বজনের কাছে সর্বমহলে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনচেতা, আশেকে রসূল ও মহান আল্লাহ্ পাকের ওলী হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি ছিল।

গ্রন্থে বারে বারে উল্লেখ করা আছে, হযরত ওয়াইসী (র) দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। এতে করে সারা ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল সমর্থক থাকা স্বাভাবিক। ঐ সময় সারা ভারতবর্ষে মুসলিম রাজনৈতিক নেতাগণের পাশাপাশি মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ তথা পীর, সূফী, বড় বড় আলিমগণ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার ছিলেন। ঐ সময় হিন্দু সম্প্রদায়ও স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানগণের সাথে একাকার হয়ে যায়। হযরত ওয়াইসী (র) মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ (র), টিপু সুলতানের পরিবারসহ

বিখ্যাত পরিবারগণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ঐ সময় সাইয়েদ আমীর আলী, নবাব আবদুল লতিফ, শাহ্‌জাদা রহিমুদ্দীন, নবাব আবদুস সাত্তার, শাহ্‌জাদা গুল মোহাম্মদ, স্যার সাইয়েদ আহমদ খানসহ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যখন স্বদেশী আন্দোলনে সোচ্চার তখন হযরত ওয়াইসী (র), কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এলাকায় স্বদেশী আন্দোলনে বিভিন্নভাবে জোরালো, সোচ্চার ভূমিকা রাখতেন বলে বিভিন্নভাবে জানতে পারা যায়।

কলকাতা মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, গাজীপুর ট্রান্সলেশন সোসাইটি, সেন্ট্রাল মোহামেডান সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থাকে হযরত ওয়াইসী (র) নানাভাবে সহায়তা করতেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার আগে ও পরে হযরত ওয়াইসী (র) কলকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে বসে স্বদেশীগণের কল্যাণে নানাভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন। শুধু তাই নয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর দেশের স্বাধীনচেতা মানুষের উপর নেমে আসে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের জুলুম অত্যাচার। সেই সময় দিশেহারা স্বদেশী মানবের কল্যাণে তিনি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করে যান এবং সাথে সাথে নবীজী (সা)-এর উসীলার উদ্দেশ্যে নবীজী (সা)-এর শানে তিনি গযল বা কাসীদা বারে বারে পড়তে থাকেন। এতে করে তিনি যে কত বড় দেশদরদি ছিলেন তা অনায়াসে বুঝে নেয়া যায়।

তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ তিনি রেখে গিয়েছিলেন ফার্সি ভাষায়; কিন্তু যথাযথভাবে সংরক্ষণ না হওয়ায় তা আজ দুষ্প্রাপ্য বলা যেতে পারে।

ইন্তেকাল

হযরত ওয়াইসী (র) হুগলী জেলার তারকেশ্বর রেললাইনের নসিবপুর স্টেশনের অন্তর্গত মোল্লাহ সিমলা গ্রামে তাঁর এক ভক্তের দাওয়াত গ্রহণ করেন। সাথে তাঁর কয়েকজন স্বনামধন্য খলীফাও ছিলেন। তিনি তাঁর মুরীদ খন্দকার আবদুর রহমানের বাড়িতে বিশ্রাম নেন।

২৯ অগ্রহায়ণ শনিবার, ১২৯৩ বাংলা মধ্যরাতে তাহাজ্জুদ নামায শেষে তিনি অসুস্থতা অনুভব করেন। এতে করে উপস্থিত সকল খলীফা ও মুরীদগণকে ডাকলেন এবং বললেন, তাঁর জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। হযরত ওয়াইসী (র) আরো বললেন, তাঁর ওপর তানফীরের ফয়েয আসছে অর্থাৎ দুনিয়া হতে রখছুত হবেন বলে ইঙ্গিত পাচ্ছেন। ঐ রাত্রে হযরত ওয়াইসী (র) মুরাকাবায় বসে সকলের সবক জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু কাকেও তাওয়াজ্জুহ প্রদান করলেন না। তবে ফুরফুরার খলীফাকে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করেছিলেন।

তাঁকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন এবং সাথে সাথে উপদেশ দিলেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পুণ্যবতী কন্যা সাইয়েদা জোহরা খাতুনের কাছ থেকে নেসবতে জামিয়ার ফয়েয যেন সবাই গ্রহণ করে। তিনি তা তাঁর পুণ্যবতী মেয়েকে দান করেছেন বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি তথায় উপস্থিত তাঁর সুযোগ্য খলীফা হযরত সূফী আহমদ আলী সুরেশ্বরী থেকে জানতে চান তাঁর অপর বিখ্যাত খলীফা হযরত মাওলানা সূফী গোলাম সালমানী কোথায়, তাঁর সাথে কিছু আলাপ ছিল। কিন্তু তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। অতঃপর তিনি ভক্তদেরকে তৎক্ষণাৎ বললেন, তাঁকে কলকাতায় পৌঁছে দেবার জন্য।

কলকাতার হাওড়াস্থ রেল স্টেশনে পৌঁছলে হযরত ওয়াইসী (র) ইন্তেকাল ফরমান। ইন্তেকালের আগ মুহূর্তে তিনি আকাশে রক্ত মেঘের আবির্ভাব হয়েছে কিনা জানতে চান। তখন সাথে সাথে তাঁর খলীফা, মুরীদ ও সাথীগণ আকাশের দিকে অবলোকন করে জানালেন যে আকাশে রক্ত মেঘের তথা লাল মেঘের সঞ্চার হয়েছে। এতে করে হযরত ওয়াইসী (র) সাথে সাথে বললেন, এটি তাঁর বিদায়ের লক্ষণ।

হযরত ওয়াইসী (র)-কে বহনকারী গাড়ি কলকাতার পথে হাওড়া রেল স্টেশন পৌঁছে এবং ঐ সময় অর্থাৎ ৮ রবিউল আউয়াল ১৩০৪ হিজরী, ৬ ডিসেম্বর ১৮৮৬ ইংরেজী, ২০ অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বাংলা, রবিবার বিকাল ৪ টায় আশেকে রসূল মহান আল্লাহর ওলী রসূল নোমা হযরত মাওলানা সাইয়েদ সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জানাযা ও দাফন

তাঁর মুবারক দেহ প্রথমে তাঁর কলকাতার অবস্থানস্থল কলকাতাস্থ তালতলার ওলিউল্লা লেইনের বিবি সালেটের মসজিদ সংলগ্ন ঘরে নেওয়া হয়।

এই মহান ওলী রসূল নোমার ইন্তেকাল সংবাদ সেকালের প্রতিকূল যোগাযোগ সত্ত্বেও দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে বিবি সালেট মসজিদ ও তাঁর আশেপাশে মানুষ দলে দলে সমাগত হতে থাকে। অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে তাঁর খলীফা, মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ।

পর দিবস সোমবার তাঁর প্রথম নামাযে জানাযা সম্পন্ন হয়। তৎপর দিবস মঙ্গলবারও তাঁর নামাযে জানাযা পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎপর দিবস বুধবার পুনঃ নামাযে জানাযা হওয়ার পর ঐ দিবাগত রাত্রে হযরত ওয়াইসী (র)-কে কলকাতা মহানগরী মানিকতলা, লালাবাগান মহল্লা, ২৪/১, মুন্সিপাড়া লেইনস্থ ২নং দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

তাঁর নামাযে জানাযায় বাংলা, আসাম, বিহারসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের হাজার হাজার লোকের সমাগত হয়েছিল। তন্মধ্যে তাঁর বিখ্যাত বিখ্যাত খলীফা ও মুরীদগণ বাদেও কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার সমস্ত মুহাদ্দিস ও শিক্ষকমণ্ডলী, কলকাতা নগরীর বিখ্যাত নাখোদা ও টিপু সুলতান মসজিদসহ প্রায় সমস্ত ছোট-বড় মসজিদের খতিব, ইমামগণ তাঁর নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। সাথে সাথে কলকাতা নগরীসহ অন্যান্য এলাকার তখনকার আমলের নবাব, পীর, মুহাদ্দিস, খতিব, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিকসহ নানান মর্যাদার বিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণ তার নামাযে জানাযায় শরীক হন।

আকৃতি ও প্রকৃতি

হযরত মাওলানা সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) অতীব স্বাস্থ্যবান, সুন্দর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ও নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব ছিলেন। মধ্যস্থলে ঈষৎ ব্যবধান রেখে ভ্রু-যুগল জোড়া ছিল, তাঁর বক্ষ ও উভয় স্কন্ধ প্রশস্ত ছিল। চক্ষু ছিল আয়ত এবং নাসিকা মানানসই উন্নত ছিল। চিবুক ছিল ঘন চাপদাড়ি আচ্ছাদিত। দন্তগুলো ছিল মুক্তা-পাঁতিসম, সুশৃঙ্খল, দৃঢ়, সুন্দর ও ঝকঝকে। মস্তক দেহের সঙ্গে বড়ই মানানসই ছিল। সারা মস্তক ছিল চুলে আবৃত।

তাঁর সমগ্র জীবনকালে কোনো প্রকার পীড়া বিন্দুমাত্র তাঁকে আক্রমণ করেনি। পৌষ-মাঘের প্রচণ্ড শীতের রাত্রেও মাত্র পাতলা কুর্তা পরিধান করে কখনো বা কেবলমাত্র একখানি পাতলা চাদরে গাত্র আবৃত করে উন্মুক্ত ছাদে দীর্ঘ সময় ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

প্রয়োজনবোধে তিনি মুচকি হাসতেন, কখনো অট্টহাস্য করেননি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাক্যালাপ হতে সব সময় বিরত থাকতেন। ধীরে ও স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। তিনি সর্বদা সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। কদাপি আড়ম্বরপূর্ণ বস্ত্রাদি পরিধান করতেন না। কেবলমাত্র দুই ঈদ-মোবারকে শিরওয়ানী ও চোগা পরিধান করতেন। পায়ে পরতেন সেলিম নাগরা জুতা। মাথায় ব্যবহার করতেন কাদেরী টুপি।

আতর ও ফুল তাঁর বিশেষ আদরনীয় ছিল। একশত মোটা দানার তাসবিহ ব্যবহার করতেন। নিজ হস্তের নকল করা কুরআন শরীফ পাঠ করতেন। তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফিয ও ক্বারী। কুরআন শরীফ, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও সুমিষ্ট স্বরে পাঠ করতেন। সমগ্র হাদীস শরীফ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কোনো হাদীস শরীফটি সহী, কোনোটি সঠিক নহে এ বিষয়ে তাঁর ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান ও স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি।

বিলাসিতা, অপব্যয় ও আলস্য ছিল তাঁর অজানা। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমি, অতীব মেধাবী, বিস্ময়কর শ্রুতিধর ও সংযমী। এক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিরেকে কাকেও ভয় করতেন না। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও নির্ভীক। অথচ তিনি ছিলেন প্রকৃত ইসলামী সাম্যবাদী, মানব-দরদি, করুণা-কাতর এবং আল্লাহ্ পাকের নিখিল সৃষ্টির প্রতি দয়ালু। প্রতি শুক্রবার প্রভাতে মিষ্টি-অন্ন প্রস্তুত করে গৃহের ছাদে ও অঙ্গণে স্বহস্তে ছিটিয়ে দিয়ে ক্ষুদিত বিহঙ্গকুলকে ভক্ষণ করাতেন। গৃহের ও পাড়ার কুকুর-বিড়ালকে তিনি আপন খাদ্য হতে সর্বদাই আহার করাতেন। তিনি অকাতরে শ্রাবণের ধারার মতো দীন-দুঃখী, অভাবী পাড়া-প্রতিবেশী ও দরিদ্র, অসহায় আত্মীয়-স্বজনকে হৃষ্টচিত্তে অর্থ, খাদ্য, পরিচ্ছদ ও আশ্রয় দান

করতেন। ছোট ছোট শিশুগণকে স্বহস্তে মিঠাই খরিদ করে দিতেন। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, পরিচিত, অপরিচিত যে কেউ তাঁর নিকট দানের প্রত্যাশায় এসে শূন্য হাতে ফিরত না, আশার অতিরিক্ত লাভ করত।

আপন পরিজন-পরিবারবর্গের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতিশীল। তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। দুই ঈদে তাদেরকে নতুন বস্ত্রাদি খরিদ করে দিতেন। পুত্র-কন্যাগণকে কলিকাতায় রেখে উপযুক্ত উচ্চ শিক্ষিত ধার্মিক আলিম দ্বারা ও স্বয়ং নিজে তালিম দিয়ে সর্বশাস্ত্রে এবং আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় উত্তম সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত করেছিলেন। নিজে পুত্র-কন্যা ও স্ত্রীকে তাসাউফ পথের নিগূঢ় সন্ধান দিয়েছিলেন ও পবিত্র কুরআন-হাদীস এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও নানা বিষয়ে বিপুল জ্ঞান দান করেছিলেন।

গৃহ-ভৃত্য ও দাসীগণকে তিনি পুত্রসম পালন করতেন ও সমচক্ষে সর্বদাই দেখতেন। তাদের প্রতি তিনি অশেষ দরদি ছিলেন।

তিনি দরিদ্র ও দূরান্তরের মুরীদগণকে নিজের কাছে রেখে, খাইয়ে ও আশ্রয় দিয়ে তরীকতের শিক্ষা দিতেন। তাঁদের শিক্ষা শেষে গৃহে ফিরবার পথ-খরচও তাদেরকে দান করতেন। বহু বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের তিনি ছিলেন মুখপাত্র। বহু পিতৃমাতৃহীন, আশ্রয়হারা তাঁর প্রদত্ত অর্থে বিদ্যাশিক্ষা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চাকরি করে অগাধ অর্থ উপার্জন করেও দুনিয়ার বুকে বিশেষ কিছুই সম্পত্তি রেখে যাননি। কলিকাতার বুকে একটি সম্পত্তিও খরিদ করেননি। পুনাশি গ্রামেও সামান্য পুকুর, বাগান, কিছু ধানক্ষেত ও একটি সাধারণ একতলা পাকা কুঠি ছাড়া এবং সামান্য জমিদারি স্বত্ব ছাড়া আর কিছুই ক্রয় করেননি। এ সমস্ত তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণীর পৈতৃক সূত্রে খরিদ করেছিলেন। উপার্জনের সমুদয় অর্থ মানুষের কল্যাণে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন।

গরীব ভদ্রলোকদের প্রতি তিনি অতীব সহানুভূতিশীল ছিলেন। গোপনে তাদেরকে অর্থ, বস্ত্রাদি এবং খাদ্য দান করতেন।

আপন পীরের প্রতি তিনি খুব মহব্বত রাখতেন। কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকার সর্দার পীর কেবলাগণের বংশধরগণের প্রতি তিনি বড়ই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদেরকে বিশেষ সম্মান করতেন। তাঁদের কেউ তাঁর ভবনে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের রাজকীয় খাদ্য, শয্যা ও সম্মান দান করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে একাসনে আহার করতেন।

ইটের ঝামা দ্বারা পদযুগল পরিষ্কার করা ও করানো তাঁর অভ্যাস ছিল। প্রায়ই তিনি আপন হস্ত দ্বারা আপন চরণদ্বয় টিপতেন। মিসওয়াক করা ও সর্বদা

অজু অবস্থায় থাকা তাঁর প্রিয়তম অভ্যাস ছিল। সমগ্র জীবনকালের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামায বারেকের তরেও তিনি ত্যাগ করেননি। তাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, গম্ভীর, মর্মস্পর্শী ছিল।

তিনি সতত সকলকে সঠিক ও সত্য-কথা বলতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, মিথ্যা কথা মানব জীবনের ইহ-পরকালকে ধ্বংস করে। কারণ মিথ্যা সমগ্র কুক্রিয়ার উৎস। তিনি সকলকে ইসলামিক বিদ্যা অর্জন করতে ও নানা ভাষা শিখতে, শুদ্ধ-পবিত্র থাকতে, তাছাউফ-পথের পথিক হতে, জাতীয় ইসলামিক পরিচ্ছদ পরিধান করতে, স্বাবলম্বী, দানশীল ও মিতব্যয়ী হতে, নম্র ও ঋজু ভাষায় কথা বলতে আদেশ করতেন।

কেউ পীড়িত হলে তাকে দেখতে যেতেন, শান্ত্বনা দান করতেন ও তার আরোগ্য প্রার্থনা করতেন। কেউ মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হতেন ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন। কেউ তাঁকে সালাম দেবার অগ্রেই তাকে সালাম প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন নিরাড়ম্বর, নিরহংকারী, নম্রভাষী।

তিনি অল্পাহারী ছিলেন। দুধ, আম, সেব ও বেদানা এবং লাউ, শাক ও গুড় খেতে পছন্দ করতেন। পান খাওয়ার অভ্যাস তাঁর ছিল। মাছ ও গোশত কখনো খালি খেতেন না, কোনো তরকারি সহযোগে মাছ-গোশত আহার করতেন। ভাত ও রুটি উভয়তেই অভ্যস্ত ছিলেন। সমগ্র জীবনে যখনই পানি পান করতেন তিন কুল্লির অধিক কখনো পান করেননি। কারবালার হৃদয়-বিদারক স্মৃতি স্মরণ করে প্রতিটি কুল্লি পান করার পর বুক ফাটা 'আহ' শব্দ উচ্চারণ করতেন।

চাকরি কার্যকালে তিনি রবিবারের ও ছুটির দিনগুলো বেতন গ্রহণ করতেন না। কোনো দিন নিজে ছুটি নিলে তারও বেতন ত্যাগ করতেন। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে বলেছিলেন, যখন তিনি ছুটির দিনে কার্য হতে বিরত থাকেন, তখন তাঁর বেতন লওয়া বিবেক অনুযায়ী অনুচিত।

কখনো কোনো মুরীদের নিকট হতে তিনি নজরানাস্বরূপ নগদ টাকা-পয়সা, সোনাদানা গ্রহণ করেননি। তবে খাদ্যাদি দিলে গ্রহণ করতেন। মুরীদের নিকট হতে অর্থ-তো নিতেনই না; বরং তিনি দরিদ্র-প্রপীড়িত মুরীদগণকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করতেন।

গভীর আগ্রহ ও প্রেমের সাথে হযরত রাসূলে পাক (সা)-এর প্রতিটি সুন্নত ও চরিত্রধারা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেছেন। তিনি ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নায়েবে রাসূলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। 'দিওয়ান-ই-ওয়াইসী' কাব্যগ্রন্থে তার ভূয়সী প্রমাণ রয়েছে। তিনি ছিলেন শরীয়তের একটি পূর্ণচ্ছবি। উক্ত 'দিওয়ান-ই-ওয়াইসী' কাব্যগ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়

তিনি দক্ষিণহস্ত গালের নিচে স্থাপনপূর্বক দক্ষিণ-পার্শ্বে কেবলামুখী হয়ে শয়ন করে নিদ্রা যেতেন। রজনীর কিয়দংশ ঘুমিয়ে বাকি সারারাত্রি জেগে মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকতেন। খোদাপ্রাপ্তি পথে সমগ্র জীবন ধরে তিনি কঠোর সাধনা করে গেছেন।

মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তিনি নিরালায় নীরবে আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রকম্পিত দেহে ক্রন্দন করতেন এবং বিনীত কণ্ঠে প্রার্থনা করতেন যেন, করুণাময় তাঁর অন্তর ও ওষ্ঠ বিভু-বন্দনায় আন্দোলিত করে ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব করেন; গোলাম যেন বাদশার যুগল চরণ-প্রান্তে ক্লান্ত কপোল রেখে লুটিয়ে পড়েন; জীবন শেষে যেন জীবন-দেবতার, মাবুদের দীদার (দর্শন) লাভ করেন। এটিই ছিল তাঁর দিন রাতের আন্তরিক, আকুল মুনাজাত।

তিনি প্রচুর পরিমাণে দরূদ শরীফ ও দু'আ ইস্তিগফার পাঠ করতেন। ইশরাক, চাশত ও তাহাজ্জুদ নামায প্রাত্যহিক নামাযের ন্যায় প্রত্যহ আদায় করতেন। ওয়াক্তিয়া নামায মসজিদে জামা'আতে পড়তেন। রমযান শরীফের রোযা রাখতেন, ঠিক সময়ে ইফতার করতেন ও প্রত্যহ সেহরী গ্রহণ করতেন। শবেকদরে ইতিকাফ করতেন।

শবে বরাত ও আশুরায় রোযা পালন করতেন। মাঝে মাঝে অন্যান্য নফল রোযাও রাখতেন। দুই ঈদে গোসল করে পরিচ্ছদ পরে আতর লাগিয়ে তাকবীর পাঠ করে ঈদগাহে গমন করতেন। পবিত্র রমযানে, আশুরায় ও শবেবরাতে দান-ধ্যান করতেন। আশুরা, রমযান, শবেবরাত, আখেরী ছাহারশোম্বাহ, ফাতেহা দোয়াজ-দাহম ও ফাতেহা-ইয়াজ দাহমে মিলাদ পড়ানো তাঁর অভ্যাস ছিল। পবিত্র রমযানের চাঁদে বহুবার কুরআন শরীফ খতম করা তাঁর আর একটি প্রিয় অভ্যাস ছিল।

তিনি লুঙ্গি ও পাজামা পরিধান করতেন। তাঁর কুর্তার, পিরহানের ঝুল অধিক ছিল। চোখে সুরমা ব্যবহার করতেন। তাঁর আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠা-বসা, দৈনন্দিন কার্যকলাপ, তাঁর জীবনধারা সম্পূর্ণ হযরত রাসূলে পাক (সা)-এর অনুরূপ ছিল।

তিনি ওলী আল্লাহ্‌দের মাযার শরীফ যিয়ারত করতে বড়ই আগ্রহী ছিলেন। তিনি আখেরী-যোহর নামায পড়তেন। তিনি তাঁর কন্যা হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র)-সহ বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামের হযরত শেখ হামিদ বাঙালী (র)-এর মাযার যিয়ারত করেছিলেন এবং হুগলী জেলার মোল্লা সিমলা গ্রামের হযরত হাসান হালবী (র)-এর মাযার তিনি একা একা যিয়ারত করেছিলেন।

পদ-মর্যাদা

হযরত সূফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) আখেরী নবী হযরত আহমদ-মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) তাঁর পরিবারগণের (রা), আহ্‌লে বায়েতগণের (রা) এবং হযরত খাজা খিজির (আ)-এর তরীকতের ইমামগণের নিকট হতে রূহানী নিস্‌বত অর্জন করে 'ওয়াইসী' নামে বিভূষিত হন।

এরূপ রূহানীভাবে তিনি সকলের দীক্ষা লাভ করেছিলেন বলে 'নিস্‌বতে-জামেয়া'র অধিকারী হন।

বিশেষভাবে হযরত নূর নবী রসূল পাক (সা)-এর স্নেহদৃষ্টি লাভ করে তিনি ঘুমে ও জাগরণে সতত মুহুর্মুহু তাঁর যিয়ারত ও নৈকট্য লাভ করতেন বলে 'রসূলে-নোমা' নামে অভিহিত হন।

তিনি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্‌শবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া এই চারি তরীকাতেই রূহানী ও প্রকাশ্যভাবে বায়াত হয়ে উচ্চশ্রেণীর খেলাফতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এজন্য তিনি 'কাদেরী, চিশতী, নক্‌শবন্দী ও মোজাদ্দেদী পীর' বলে আখ্যায়িত।

তিনি হযরত ওয়ায়েস করনি (র) হতে রূহানী দীক্ষা লাভ করেছিলেন।

মারেফতের মার্গে উন্নীত হয়ে খোদা তাআলার অসীম অনুগ্রহে প্রথমত তিনি 'কুতবুল-ইরশাদ' নামের উচ্চ পদটি লাভ করেছিলেন।

তিনি নিয়ত নিজেকে গুপ্ত রাখতে প্রয়াস পেতেন এবং আপন অবস্থা হাল ও পদমর্যাদা সারা জীবন ধরে গোপন রেখে গিয়েছেন। এই পদের চরিত্রই হলো প্রচ্ছন্ন রাখা।

তিনি কলকাতার মতো বিলাসিতার লীলাভূমিতেও 'সূফী' নামে বিভূষিত হন। আপামর সকলেই সেই সময় তাঁকে হযরত সূফী সাহেব বলে পরম সমাদরে ডাকতেন। তাঁর নিরাড়ম্বর ও নিরঙ্কার জীবন-দৃষ্টান্ত প্রাথমিক ইসলামিক যুগের পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার মহান সূফীগণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি তিনি অসীম, অনন্ত, আকুল ব্যাকুল প্রেমিক-পাগল ছিলেন। মুহূর্তেই ও মুহুর্মুহু তিনি 'ফানাফির-রসূল' হয়ে যেতেন। আপনার অস্তিত্ব ভুলে হযরত নূর নবী আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর মধ্যে একাকার হয়ে যেতেন বলে তাঁকে 'ফানাফির-রসূল' নামে অলংকৃত করা হয়।

ইত্যাকার রসূল-প্রেমের বিদ্যুৎ-বহ্নি-প্লাবনের ঢল তাঁর বিখ্যাত 'দিওয়ান-ই-ওয়াইসী' নামক মহাকাব্য গ্রন্থের পাতায় পাতায় কোলাহল করে নেমেছে ও আজও সতত উচ্ছ্বসিত ছন্দে নামছে।

নসীহত

সাহাবা (রা) থেকে শুরু করে অদ্য পর্যন্ত আল্লাহপাকের বিশিষ্ট ও প্রিয় বান্দাগণ বিভিন্নভাবে উপদেশ বা নসীহত করে গেছেন। কিন্তু হযরত ওয়াইসী (র) দিওয়ানে ওয়াইসী ছাড়া পৃথক কোনো ওসীয়ত বা নসীহত লিখে গেছেন বলে জানা যায়নি।

তবে হযরত ওয়াইসী (র)-এর দিওয়ানে ওয়াইসীর ৩১৪২টি শ্লোক মূলত নবীজী (সা)-এর শানে প্রেম ভালোবাসায় নিবেদিত। এই সব শ্লোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি তাঁর মুরীদ, খলীফাসহ উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি ওসীয়ত ও নসীহত করে গেছেন বলা যায়। তাঁর গযল ও কাসীদার নিরিখে কটি নসীহত পেশ করা গেল।

১. মানুষের ঈমান এবং আকীদার লক্ষণ ও প্রমাণ হচ্ছে নবীজী (সা)-এর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও অগাধ ভালোবাসা।

২. নবীজী (সা)-এর প্রেমে আত্মহারা হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

৩. নবীজী (সা) মহান আল্লাহ্‌পাককে দেখার আয়নাস্বরূপ। নবীজী (সা)-এর সুন্নতের অনুসরণ করে সীরাতে মুস্তাকীমে চলা।

৪. যারা নবীজী (সা)-এর দিদার চায় তারা যেন জীবনের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস হারাম করে।

৫. নিবেদিতপ্রাণ নবীজী (সা)-এর প্রেমিকগণের সালাম নবীজী (সা)-এর দরবারে পৌঁছে যায়।

৬. যে জাতি নবীজী (সা)-এর সুন্নত ছেড়ে দেয় সে জাতি শয়তানেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

৭. এ দুনিয়ায় নবীজী (সা)-কে অনুসরণ করে আখিরাতে কামিয়াবি হাসিল করতে হবে। নতুবা আখিরাতে বিভীষিকার সম্মুখীন হতে হবে।

৮. যে ব্যক্তি কামিয়াবি চায় সে যেন মদীনা মুনাওয়ারামুখী হয়।

৯. নবীজী (সা)-এর কদম যেখানে, শান্তি সেখানেই। নবীজী (সা)-এর আবির্ভাবে বসন্তের আগমন ঘটেছে।

১০. মনের গভীরে নবীজী (সা)-এর প্রেমের বাগান তৈরি করতে হবে। এতেই সীরাতে মুস্তাকীম।

১১. যে মনপ্রাণ, নবীজী (সা)-এর বিচ্ছেদে ব্যথায় অস্থির হয় না সে মনপ্রাণ মৃত। আল্লাহ্ পাকের নিকট বারে বারে প্রার্থনা করতে হবে কিয়ামতের দিন যাতে নবীজী (সা)-এর সুপারিশ নসিব হয়।

১২. জগতে যারা নবীজী (সা)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা যশ ও খ্যাতি লাভ করে। অপরদিকে যারা নবীজী (সা)-এর মুহাব্বতের দরজায়-হাজিরা দেয় না এবং যে চোখ নবীজী (সা)-কে দেখে না সে মনের ও চোখের কোনো মূল্য নেই।

১৩. নবীজী (সা)-এর কদমের ধূলির কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোনো তুলনা হয় না।

১৪. দুনিয়াতে যদি সবার আগে কাউকে আপন রূপে পেতে চায় তবে নবীজী (সা)-কে পেতে হবে।

১৫. সত্যান্বেষী হতে হলে নবীজী (সা)-এর চরণের ধুলায় থাকতে হবে। তবেই আল্লাহ্ পাককে লাভ করা যাবে।

মাযার শরীফের বর্তমান অবস্থা

এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী কলকাতার বিখ্যাত মানিকতলার যে কবরস্থানে শায়িত ঐ এলাকার ঠিকানা ২৪/১ মুন্সিপাড়া লেইন, লালাবাগান, মানিকতলা, কলকাতা-৭০০০০৬। বর্তমানে এক একরের কিছু বেশি এরিয়ায় ঐ কবরস্থানটি অবস্থিত। তথায় কলকাতাকেন্দ্রিক ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন গঠিত আছে। কিন্তু ঐ মাযার ও কবরস্থান এরিয়ায় পূর্ব সংলগ্ন সহ আরো বড় ধরনের এরিয়া ছিল উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার আগে। বর্তমানে এসব জায়গা বেদখল হয়ে যায়।

বিশাল কলকাতা নগরীর দূর থেকে টেক্সী চালকরা লালাবাগান, মুন্সিপাড়া লেইন বললে সহজে চিনতে পারে না। তাদেরকে প্রথমে মানিকতলা বলতে হয়। মানিকতলা কলকাতার প্রসিদ্ধ এরিয়ার নাম। ঐ মানিকতলায় হযরত ওয়াইসী (র)-সহ হযরত আজানগাছী (র) হযরত সফীউল্লা (র)-সহ আরো অনেক আল্লাহ্‌র ওলী চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। অন্যান্য স্থান থেকে টেক্সীযোগে মানিকতলায় পৌঁছে স্থানীয় জনগণ বা দোকান থেকে সংবাদ নিয়ে লালাবাগান, মুন্সিপাড়া লেইনে পৌঁছতে হয়। নির্মল নামক এক হিন্দু ভদ্রলোক হযরত ওয়াইসী (র)-এর মাযার ও কবরস্থান এরিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ দেখাশোনা করে আসছেন। বর্তমানে তিনি অতি বৃদ্ধ ও চলৎশক্তি রহিত।

হযরত ওয়াইসী (র) যে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ৩৫ জন খলীফা রেখে গেছেন তা মনে হয় বিশ্বের ইতিহাসে কম ব্যক্তিত্বেরই নসীব হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাঁর মাযারসংলগ্ন কবরস্থানের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না বলে মনে করি।

জানি না ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনগত কোন দিকনির্দেশনা আছে কিনা মুসলমানগণের মাযার, মসজিদ, কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন হয়ত কোনো কিছুতে সরকারের সাথে দেন-দরবার করতে পারবে। কিন্তু অর্থ যোগান দেয়ার ব্যাপারে হযরত ওয়াইসী (র)-এর রেখে যাওয়া বিশাল তরীকত জগতের ভাইদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর বিশিষ্ট খলীফা ফুরফুরার হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (র) মাযারের সম্মুখ স্থানে একটি মর্মর ফলক স্থাপন করেছেন। কিন্তু কয় বছরের ব্যবধানে তা আর রক্ষিত নেই। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওয়াইসী (র)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত সাইয়েদ ওয়াজেদ আলী (র)-এর বিখ্যাত খলীফা হযরত ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (র)-এর স্ত্রী বর্তমান মাযার আকারে সংস্কার করেন। হযরত ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (র)-এর পুত্র ও পীর হযরত মোজাম্মেল হক সাহেব ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মাযার শরীফ সাদা মর্মর পাথর দিয়ে পুনঃসংস্কার করেন।

পরবর্তীতে ওয়াইসী (র)-এর আরেক বিশিষ্ট খলীফা হযরত সূফী আহমদ আলী সুরেশ্বরী (র)-এর নাতি (পৌত্র) হযরত নূরে আখতার হোসাইন আহমদী নূরী সাহেব মাযার ও কবরস্থানের প্রবেশপথে একটি গেইট নির্মাণ করে দেন এবং মাযার সংলগ্ন পাথর খোদাই করে হযরত ওয়াইসী (র)-এর ৩৫ জন খলীফার নাম স্থাপন করে দেন। সাথে সাথে সংলগ্ন রাস্তাও সংস্কার করেন। এসব কিছুতে ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন সহযোগিতা করে আসতেছে। প্রতি বছর ২০ অগ্রহায়ণ ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি আলোচনা মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং একটি স্মরণিকাও বের করে থাকেন বলে জানতে পারি।

এখানে উল্লেখ্য, আমার বারে বারে কলকাতা গমনের সুযোগ হয়ে থাকে ভারতে যিয়ারত ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। এতে করে বারে বারে হযরত ওয়াইসী (র)-এর যিয়ারতে গমন করার সৌভাগ্য হয়ে আসছিল।

সন্তান-সন্ততি

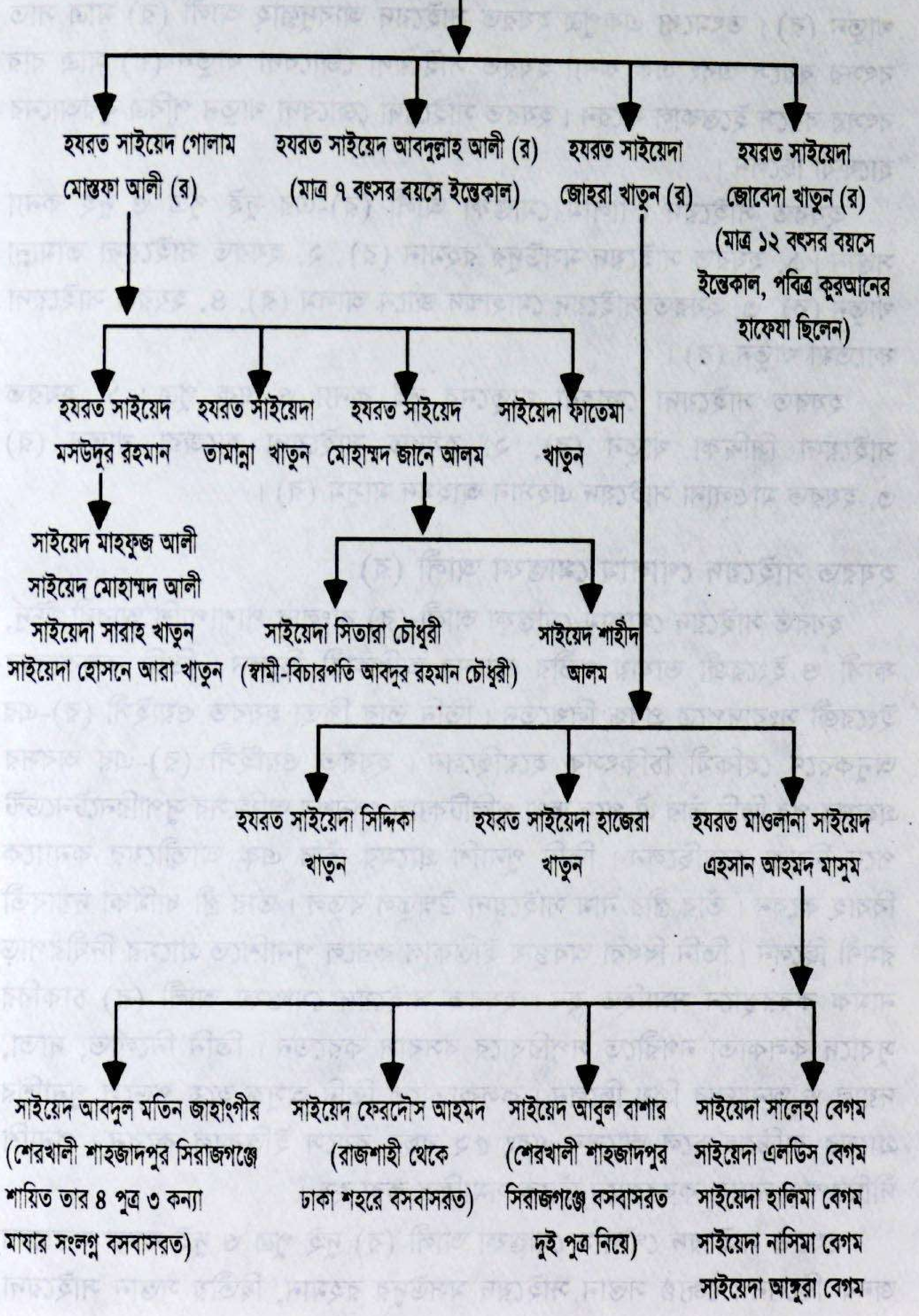

হযরত ওয়াইসী (র)-এর দুই পুত্র সন্তান ও দুই কন্যা সন্তান ছিলেন। ১. হযরত সাইয়েদ গোলাম মোস্তফা আলী (র) ২. হযরত সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আলী (র) ৩. হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র) ৪. হযরত সাইয়েদা জোবেদা খাতুন (র)। তৎমধ্যে একপুত্র হযরত সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আলী (র) মাত্র সাত বৎসর বয়সে এবং এক কন্যা হযরত সাইয়েদা জোবেদা খাতুন (র) মাত্র বার বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত সাইয়েদা জোবেদা খাতুন পবিত্র কুরআনের হাফেযা ছিলেন।

হযরত সাইয়েদ গোলাম মোস্তফা আলী (র)-এর দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান। ১. হযরত সাইয়েদ মসউদুর রহমান (র) ২. হযরত সাইয়েদা তামান্না খাতুন (র), ৩. হযরত সাইয়েদ মোহাম্মদ জানে আলম (র), ৪. হযরত সাইয়েদা ফাতেমা খাতুন (র)।

হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনের দুই কন্যা ও এক পুত্র। ১. হযরত সাইয়েদা সিদ্দিকা খাতুন (র), ২. হযরত সাইয়েদা হাজেরা খাতুন (র) ৩. হযরত মাওলানা সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুম (র)।

হযরত সাইয়েদ গোলাম মোস্তফা আলী (র)

হযরত সাইয়েদ গোলাম মোস্তফা আলী (র) বাংলার পাশাপাশি আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি কলকাতার ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি তাঁর পিতা হযরত ওয়াইসী (র)-এর অনুকরণে হেকিমী চিকিৎসক হয়েছিলেন। হযরত ওয়াইসী (র)-এর অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর ঐ পদে তথা পলিটিক্যাল পেনশন অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি পুনাশি গ্রামের তাঁর এক আত্মীয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম সাইয়েদা উম্মতুল রতুল। তাঁর স্ত্রী ধার্মিকা দয়াবতী রমণী ছিলেন। তিনি বিধবা অবস্থায় ইন্তিকাল করলে পুনাশিতে গ্রামের দিঘীরপাড় নামক কবরস্থানে সমাহিত হন। হযরত সাইয়েদ মোস্তফা আলী (র) চাকরির সুবাদে কলকাতা নগরীতে সপরিবারে বসবাস করতেন। তিনি নির্লোভ, দাতা, দয়ালু ও অনাড়ম্বর প্রিয় ছিলেন। কলকাতাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পুনাশির গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন এবং ৫২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। পুনাশি দীঘিরপাড় নামক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত সাইয়েদ গোলাম মোস্তফা আলী (র) দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সন্তান সাইয়েদ মসউদুর রহমান, দ্বিতীয় সন্তান সাইয়েদা

তামান্না খাতুন, তৃতীয় সন্তান সাইয়েদ জানে আলম, চতুর্থ সন্তান সাইয়েদা ফাতেমা খাতুন।

হযরত সাইয়েদ মসউদুর রহমান

হযরত গোলাম মোস্তফা আলী (র)-এর প্রথম পুত্র হযরত সাইয়েদ মসউদুর রহমান। তাঁর বংশধরেরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বসবাস করতেছেন। তিনি কলকাতা মুসলিম ব্যুরিয়াল বোর্ডের চাকরি গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি পুনাশিতে চলে গেলে তথায় তিনি ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। পুনাশিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সাইয়েদ মসউদুর রহমানের দুই ছেলে সাইয়েদ মাহফুজ আলী, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী ও দুই কন্যা সাইয়েদা সারাহ খাতুন ও সাইয়েদা হোসেন আরা খাতুন।

সাইয়েদ মাহফুজ আলী, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী ও সাইয়েদা সারাহ্ খাতুন পুনাশি মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় বসবাসরত হন এবং ঢাকাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁদের ওয়ারিশরা ঢাকাসহ বাংলাদেশে বসবাসরত। অপরদিকে সাইয়েদ মসউদুর রহমানের কনিষ্ঠা কন্যা সাইয়েদা হুসনে আরা খাতুন পৈতৃক বাড়িতে অর্থাৎ পুনাশিতে বসবাসরত। তাঁর স্বামী পুনাশিরই খোন্দকার সুফী মাওলানা জিয়াউল হক, বর্তমানে ৮১ বছরের বৃদ্ধ। তাঁদের সংসারে চার ছেলে, চার মেয়ে। তৎমধ্যে দুই মেয়ে ঢাকায় বসবাসরত।

সাইয়েদা তামান্না খাতুন

হযরত সাইয়েদ গোলাম মোস্তফা আলীর দ্বিতীয় সন্তান হযরত সাইয়েদা তামান্না খাতুন। সাইয়েদা তামান্না খাতুনকে ভারতের বীরভূম জেলার পুস্তলিয়া গ্রামে শাদী দেওয়া হয়। তথায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

সাইয়েদা জানে আলম

হযরত সাইয়েদ গোলাম মোস্তফা আলীর তৃতীয় সন্তান সাইয়েদ জানে আলম। তিনি ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ফার্সী ভাষায় এম. এ. (মাস্টার্স) পাস করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে। অতঃপর আইন বিষয়ে পাস করেন। প্রথমে তিনি ভারতে পশ্চিমবঙ্গের আলীপুর জজকোর্টে আইন পেশায় যোগদান করেন। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টে আইন পেশায় যোগ দেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকায় হাইকোর্টের আইন পেশায় যোগ দেন এবং পরবর্তী বছর স্থায়ীভাবে ঢাকা চলে আসেন। তাঁর স্ত্রী মোসাম্মৎ সাদেকা খাতুন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে কলকাতা নগরীর পার্ক সার্কাসের চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের নিকটে বিখ্যাত গোবরা : (১) কবরস্থানে তাঁর নানা খান বাহাদুর ফজলুল হক (মুর্শিদাবাদ খড়কপুর)-এর.পাশে সমাহিত করা হয়।

সাইয়েদ জানে আলম তাঁর কলকাতাস্থ ৬৯/৪ থিয়েটার রোড, পার্ক সার্কাস-এর বাড়ি ঢাকার ২৯, ওয়্যারী স্ট্রীট, ওয়্যারী, ঢাকা এর সাথে এক্সচেঞ্জ করেন।

সাইয়েদ জানে আলম ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। ঢাকার বনানী কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর এক কন্যা ও এক পুত্র।

কন্যা সাইয়েদা সেতারা চৌধুরী

সাইয়েদ জানে আলমের কন্যার নাম মোসাম্মৎ সাইয়েদা সেতারা চৌধুরী। তিনি খ্যাতনামা বিচারপতি (বর্তমানে মরহুম) আবদুর রহমান চৌধুরীর স্ত্রী। সাইয়েদা সেতারা চৌধুরীর জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়। বর্তমানে তিনি ঢাকার ৩২ ধানমণ্ডিস্থ স্বামীগৃহে বসবাসরত। তাঁর দুই কন্যা ও দুই পুত্র। (১) রোহেলী রহমান চৌধুরী। তিনি চট্টগ্রামের ডাক্তার মঈনুল ইসলাম মাহমুদের স্ত্রী (২) যোবায়ের রহমান চৌধুরী। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি (৩) ড. রিয়াজুর রহমান চৌধুরী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। (৪) ওয়াছিফা রহমান চৌধুরী। তিনি বাগেরহাট জেলার ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ যোবায়েরের স্ত্রী। ওয়াছিফা রহমান চৌধুরী স্বামীসহ বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত।

ব্যারিস্টার শাহীদ আলম

সাইয়েদ জানে আলমের দ্বিতীয় সন্তান ও একমাত্র পুত্র ব্যারিস্টার শাহীদ আলম। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ শিক্ষা শেষ করে তিনি ব্যারিস্টারী পাস করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশায় রত। তিনি তাঁর পিতার ওয়ারীস্থ বাড়িটি ২০০১ খ্রিস্টাব্দে হস্তান্তর করে ঢাকার ধানমণ্ডিস্থ ৪নং রাস্তা, ২৩ নং বাড়ির ৩ ও ৪নং ফ্ল্যাট খরিদ করে বসবাস করতেছেন। তাঁর এক পুত্র ব্যারিস্টার সাকিব আলম ও এক কন্যা সাবরিনা আলম।

সাইয়েদা ফাতেমা খাতুন

সাইয়েদ গোলাম মোস্তফা আলী (র)-এর কনিষ্ঠ সন্তান ও ২য়া কন্যা সাইয়েদা ফাতেমা খাতুন।

তাঁকে শাহপুরে হযরত সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুমকে অর্থাৎ আপন ফুফাত ভাইকে শাদী দেওয়া হয়।

হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র)

হযরত ওয়াইসী (র)-এর কন্যা হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র)। তিনি ১২২৮ বাংলা এক সকালে কলকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা শহরে তিনি বড় হন। আরবীর পাশাপাশি ফার্সি এবং উর্দু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তেমনিভাবে কুরআন মাজীদের তাফসীর, হাদীস শরীফসহ তাঁর মাঝে ধর্মীয় জ্ঞানের অত্যধিক গভীরতা ছিল। বাংলা সাহিত্যের ওপর তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল না, তবে সহজে বাংলা বলতে ও বুঝতে পারতেন। তাঁর সমস্ত লেখালেখি ফার্সি অথবা উর্দুতে। তিনি পিতাকে অত্যধিক ভক্তি করতেন এবং সবসময় তাঁর সংস্পর্শে থাকতে সচেষ্ট থাকতেন। হযরত ওয়াইসী (র) তাঁর অতি আদরের এই কন্যার ভিতর অসাধারণ যোগ্যতা উপলব্ধি করতে পেরে তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তিনি পিতার হাতে মুরীদ হয়ে তরীকতের অতি উচ্চ স্তরে পৌঁছে যান। তাঁকে বাংলার রাবেয়া বসরী বলা হয়ে থাকত। হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনকে শাহপুর গ্রামের জমিদার মুন্সিবাড়ির হযরত সাইয়েদ হোসেন (র)-এর সহিত শাদী দেয়া হয়। হযরত সাইয়েদ হোসেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সাইয়েদা জোহরা খাতুনকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। হযরত ওয়াইসী (র)-এর প্রখ্যাত খলীফাগণ হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনকে অত্যধিক সম্মানের সহিত মূল্যায়ন করতেন। তাঁর ইন্তেকালের কদিন আগে তিনি নিজ পুত্র থেকে জিজ্ঞেস করেন আজ কি বার ও কয় তারিখ। তখন তাঁর সুযোগ্য পুত্র বারের নাম ও তারিখ বলার পর তিনি পুত্রকে আদেশ দেন তিনি আর মাত্র ৮ দিন জীবিত আছেন। এই ৮ দিন যাতে তাঁর শয়নকক্ষের দরজা খোলা রাখা হয়। এই বলে তিনি তাঁর শয়নকক্ষে রাতদিন ইবাদতে মশগুল হয়ে যান এবং ৮ দিনের দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐদিন ১৭ আষাঢ় ১৩৪৮ বাংলা। তাঁকে মুর্শিদাবাদের শাহ্পুর গ্রামে দাফন করা হয়। মোসাম্মৎ সাইদা জোহরা খাতুনের দুই কন্যা। যথা : সাইয়েদা সিদ্দিকা খাতুন (র) ও সাইয়েদা হাজেরা খাতুন (র) এবং একমাত্র পুত্র সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুম (র)।

সাইয়েদা সিদ্দিকা খাতুন

হযরত সাইয়েদা সিদ্দিকা খাতুনকে মুর্শিদাবাদে বিনুদিয়া তথা শাহপুরের পার্শ্বে গ্রামে শাদী দেয়া হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র সাইয়েদ গোলাম মাহবুব।

সাইয়েদা হাজেরা খাতুন

হযরত সাইয়েদা হাজেরা খাতুনের স্বামী খন্দকার আবদুল আজিজ (র)। তাঁদের এক পুত্র, চার কন্যা। যথা : খোন্দকার বদরুদোজ্জা, বিবি আছিয়া খাতুন, বিবি জোবেদা খাতুন, বিবি আনোয়ারা খাতুন ও বিবি আয়েশা খাতুন।

সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুম (র)

হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র)-এর একমাত্র পুত্র হযরত মাওলানা সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুম। তিনি শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ ছিলেন বলে তাঁর উপাধি মাসুম হয়। ফার্সি ও উর্দু ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলা মোটামুটি জানতেন। তিনি দিওয়ানে ওয়াইসী গ্রন্থ সংকলন ও নামকরণ করেন। তাঁর অতি নম্র, ধীরস্থির ও কোমল হৃদয়ের কথা সর্বজনের কাছে তখন প্রকাশ ছিল। আপন মামাতো বোন হযরত সাইয়েদা ফাতেমা খাতুনের সহিতো তাঁর বিবাহ হয়। হযরত সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুম ১৯৪৩ ইংরেজীর ৩১ ডিসেম্বর, ১৪ পৌষ ইন্তেকাল করেন। মুর্শিদাবাদ শাহপুরে তিনি সমাহিত হন।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুম-এর চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা। ১. সাইয়েদ আবদুল মতিন জাহাঙ্গীর। তিনি উপমহাদেশ বিভাগের পর শেরখালী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ জেলায় চলে আসেন তথায় তিনি শায়িত। তাঁর চার পুত্র তিন কন্যা তথায় বসবাসরত। ২. সাইয়েদ ফেরদৌস আহমদ। তিনি রাজশাহী মহানগরীর মীরের চক মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে রামচন্দ্রপুরে বসবাসরত ছিলেন। বর্তমানে ঢাকার মিরপুরে বসবাসরত। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। ৩. সাইয়েদ আবুল বাশার। তিনি দুই পুত্র নিয়ে শেরখালী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জে বসবাসরত।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুমের পাঁচ কন্যা যথা : ১. সাইয়েদা সালেহা বেগম, ২. সাইয়েদা এলডিশ বেগম, ৩. সাইয়েদা হালিমা বেগম, ৪. সাইয়েদা নাছিমা বেগম, ৫. সাইয়েদা আংগুরা বেগম।

পুনাশি ও শাহপুরের অবস্থান

গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বারে বারে পুনাশি ও শাহপুরের কথা উল্লেখ করা আছে। যেহেতু পুনাশিতে হযরত ওয়াইসী (র) দাম্পত্য জীবন শুরু করে বসতি স্থাপন করেন এবং শাহপুর হযরত ওয়াইসী (র)-এর একমাত্র পুণ্যবতী কন্যা সাইয়েদা জোহরা খাতুনের শ্বশুর বাড়ি।

ভারতের পাঠকগণের পক্ষে পুনাশি ও শাহপুরের অবস্থান জানা বা নির্ণয় করা হয়ত কিছুটা সহজতর। কিন্তু বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাঠকের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রে পুনাশি ও শাহপুরের অবস্থান নির্ণয় করা সহজতর নাও হতে পারে।

বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা নেই, যে জেলায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর সিলসিলাভুক্ত মুরীদ নেই। কোনো কোনো জেলায় শতশত বা কোনো কোনো জেলায় হাজার হাজার। তবে বাংলাদেশের এমন কয়েকটি জেলা আছে যে জেলায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর সিলসিলাভুক্ত লক্ষ লক্ষ মুরীদ রয়েছে।

অতএব সে কথা বিবেচনায় এনে গ্রন্থে পুনাশি ও শাহপুরের অবস্থানের ওপর ধারণা পেশ করলাম।

পুনাশি ও শাহপুর বিখ্যাত মুর্শিদাবাদ জেলার অংশ বিশেষ। মুর্শিদাবাদ ভারতের একটি অতি আলোচিত জেলা। নবাব মুর্শিদকুলি খানের নামকরণে মুর্শিদাবাদ।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুনের যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে ইংরেজরা ভারত দখলের দিকে অগ্রসর হয়। চারটি মহকুমা নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা। এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত মহকুমা প্রথাকে বাংলাদেশে এরশাদ সরকার বিলুপ্ত করে জেলায় উন্নীত করে। কিন্তু ভারতে আজও মহকুমা প্রথা থেকে যায়। কান্দি, জংগীপুর, বহরমপুর, লালবাগ এই চার মহকুমা নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা। তবে ব্রিটিশরা নানা চিন্তা করে মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও নবাব মুর্শিদকুলি খানের মূল অবস্থানগত এরিয়া লালবাগ মহকুমা নামকরণ করে বহরমপুরকে

মুর্শিদাবাদের জেলা সদর করে। পুনাশি ও শাহপুর মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের কান্দি মহকুমার অন্তর্গত। দীর্ঘদিন যাবৎ পুনাশি ও শাহপুর ভরতপুর থানার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু গত সাত-আট বছর আগে সালারকে থানায় উন্নীত করায় বর্তমানে পুনাশি সালার থানার অন্তর্গত। অপরদিকে শাহপুর ভরতপুর থানার অন্তর্গত থেকে যায়। পুনাশি থেকে শাহপুর প্রায় ১০/১১ কিলোমিটার ব্যবধানে।

পুনাশি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত হলেও পুনাশিস্থ হযরত ওয়াইসী (র)-এর বাড়ি থেকে মাত্র ৪০০/৫০০ মিটার পূর্বে পুনাশিবাসীর রেলস্টেশন জাহমতপুর বাহরান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। শুধু তাই নয় পুনাশিবাসীর পোস্ট অফিস বাহরান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত এবং বাহরানের মাত্র ১৩ কিলোমিটার দূরত্বে কাটওয়া বর্ধমানের একটি মহকুমা শহর। এতে করে ভারতে অনেকে হযরত ওয়াইসী (র)-কে বর্ধমানবাসী বলে ভুল করে থাকে।

পুনাশি ঃ পুনাশিস্থ রেলস্টেশন জাহমতপুর বাহরান হাওড়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১৫৫ কিলোমিটার উত্তরে। অপরদিকে জাহমতপুর বাহরান মুর্শিদাবাদের জেলা সদর বহরমপুর প্রায় ৪৫ কি.মি. দক্ষিণে। মহরমপুর থেকে মূল মুর্শিদাবাদ শহর (লালবাগ মহকুমা সদর) প্রায় ১১ কি. মি. আরো উত্তরে।

ভারতে যেমনি বৈদ্যুতিক চালিত রেল চলাচলের বিস্তৃতি রয়েছে তেমনি ডিজেল চালিত রেল চলাচলের বিস্তৃতিও রয়েছে। সে হারে কলকাতার হাওড়া ও শিয়ালদহ রেলস্টেশন থেকে ১৪৩ কি. মি. উত্তরে কাটওয়া রেল জংশন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক চালিত। কাটওয়া থেকে জাহমতপুর বাহরান ও সালার হয়ে বহরমপুরের দিকে রেল চলে যায় ডিজেল চালিত ইঞ্জিন দিয়ে। বৈদ্যুতিক চালিত রেলের গতি দ্রুততার সাথে উঠানামা করতে পারে।

আগেই উল্লেখ করেছি জাহমতপুর বাহরান রেল স্টেশন থেকে মাত্র ১০ মিনিটের পায়ে হাঁটার পথ হযরত ওয়াইসী (র)-এর বাড়ি। হযরত ওয়াইসী (র)-এর একমাত্র পুত্র হযরত সাইয়েদ গোলাম মোস্তফা আলী (র)-এর দুই পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র সাইয়েদ জানে আলমের ওয়ারিশগণ ঢাকায় বসবাসরত। জ্যেষ্ঠ পুত্র সাইয়েদ মসউদুর রহমানের ২ পুত্র ও ১ কন্যার ওয়ারিশ ঢাকায় বসবাসরত। অপর কন্যা সাইয়েদা হোসনে আরা খাতুন তাঁর স্বামী পুনাশিস্থ হযরত ওয়াইসী (র)-এর খলীফা হযরত সূফী একরামুল হক (র)-এর নাতি খোন্দকার মাওলানা

সূফী জিয়াউল হককে নিয়ে ঐ বাড়িতে বসবাসরত। তাঁদের চার পুত্র ও চার কন্যা। হযরত ওয়াইসী (র)-এর নির্মিত একতলা দালানটি খোন্দকার মাওলানা সূফী জিয়াউল হক সংস্কার করে দোতলায় রূপদান করান। ঐ বাড়ির মাত্র ২০০/৩০০ মিটার দক্ষিণে বাড়ি ও পাড়ার জামে মসজিদ। সর্বমহলের সহযোগিতা নিয়ে মূল কাঠামো ঠিক রেখে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

বাড়ি ও মসজিদের কয়েকশো মিটার দক্ষিণে পুনাশি দীঘি। ঐ দীঘির উত্তর পাড়ে হযরত ওয়াইসী (র)-এর পুণ্যবতী স্ত্রীর একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ এবং জ্যেষ্ঠ নাতির কবর রয়েছে। সাইয়েদা হোসনে আরা বেগম যেমনি বৃদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক তেমনি তাঁর স্বামী হযরত সূফী জিয়াউল হক আশি ঊর্ধ্ব বয়সের অতি বৃদ্ধ। চলাফেরা করতে অক্ষম। তাঁর সন্তানরা তাঁদের বাড়ি, ফলের বাগান, একাধিক পুকুর ও জমি-জমা নিয়ে বসবাসরত। পুনাশির সাথে কলকাতার রেল যোগাযোগের পাশাপাশি সড়ক যোগাযোগও রয়েছে। তবে ভারতে সড়কের চেয়ে রেল যাতায়াত তুলনামূলক আরামদায়ক।

শাহপুর ঃ পুনাশি রেলস্টেশন জাহমতপুর বাহরান থেকে মাত্র ৫ কি. মি. উত্তরে সালার রেলস্টেশন। সালার থানায় উন্নীত হওয়ায় রেলস্টেশনের গুরুত্ব বেশি। সালার থেকে ৮/১০ কি. মি. পশ্চিমে শাহপুরে হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র)-এর শ্বশুরবাড়ি। সালার থেকে অপর থানা সদর ভরতপুরগামী বড় পাকা রাস্তা দিয়ে বিনোদিয়া জংশনে পৌঁছলে তথা হতে উত্তর পশ্চিম ২/৩ কি. মি. ছোট কাঁচা রাস্তায় শাহপুরস্থ হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র)-এর শ্বশুরবাড়ি। বর্তমানে ঐ রাস্তার অবস্থা ভাল নয়।

গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে, হযরত জোহরা খাতুন (র)-এর শ্বশুরগোষ্ঠী মুর্শিদাবাদের কয়েকটি জমিদার পরিবারের মধ্যে একটি। ঐ পরিবারের বৃহদাকারের উঁচু ভিটা, তিনতলাবিশিষ্ট বৃহদাকারের দালান, কাচারি বাড়ি, পুকুর ইত্যাদি এককালে সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদী পরিবারের জৌলুশ বহন করত। কিন্তু বাস্তবে আজ তা হারিয়ে গেছে। এখন ঐ বিশাল ভিটায় বাস্তবে আজ একটি দালাননামক ছোট গৃহ দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। তাও আবার রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনের স্বামীর ওয়ারিশগণ বাংলাদেশের ঢাকা ও শাহজাদপুরসহ নানান স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসরত। শাহপুরস্থ ঐ জমিদার বাড়িতে হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনের দেবরের নাতির ছেলে ৮০ ঊর্ধ্ব বয়সের বৃদ্ধ সাইয়েদ গোলাম রসূল সন্তান-সন্ততি নিয়ে বসবাসরত।

সাইয়েদা জোহরা খাতুনের শ্বশুরবাড়ির নিকটস্থ বৃহদাকারের পুকুর রয়েছে। ঐ পুকুরকে আন্দুয়া পুকুর বলে। ঐ পুকুরের পাড়ে হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন, তাঁর স্বামী, স্বামীর গোষ্ঠী-জ্ঞাতি, সাইয়েদা জোহরা খাতুনের একমাত্র সন্তান হযরত সাইয়েদ এহসান আহমেদ মাসুমসহ ঐ পরিবারের কম-বেশি সবাই চিরনিদ্রায় শায়িত।

কলকাতা থেকে শাহপুর যেতে হলে কাটওয়া হয়ে সালার রেলস্টেশনে নেমে যে কোনো গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। তবে সড়কের চেয়ে রেল যাতায়াত উত্তম মনে করি। শাহপুরসংলগ্ন সীজ গ্রাম। তথায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর প্রথম ও স্বনামধন্য বুজুর্গ খলীফা হযরত সূফী আবদুল হক (র) চিরনিদ্রায় শায়িত।

গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে, হযরত ওয়াইসী (র) হযরত হামিদ বাঙালীর ঘিয়ারতের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকোট যাতায়াত করতেন। কাটওয়া রেল জংশন এবং বর্ধমান জেলার মহকুমা শহর।

কাটওয়া হতে বর্ধমান জেলা শহরের দূরত্ব সড়কপথে ৬০ কি. মি.। অপরদিকে কাটওয়া থেকে সড়কপথে মঙ্গলকোটের দূরত্ব ৩০ থেকে ৩৫ কি. মি.। মঙ্গলকোট থেকে বর্ধমান জেলা সদর ৩৫ থেকে ৪০ কি. মি.। কাটওয়া থেকে মঙ্গলকোট ও বর্ধমান যাতায়াতে সড়ক যোগাযোগই মূখ্য।

পীর সাহেব হযরত নিজামপুরী (র)

অত্র গ্রন্থে বারে বারে উল্লেখ করা আছে হযরত ওয়াইসী (র)-এর শ্রদ্ধাভাজন পীর সাহেব হচ্ছেন হযরত মাওলানা সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)। তিনি ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১২০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন বলে বিভিন্ন লেখকগণ ধারণা করে আসছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ গজনীর বাদশা ছিলেন বলে জানতে পারা যায়। গজনী থেকে অনেকের মতো তাঁর পূর্বপুরুষও দিল্লীতে হিজরত করেন। দিল্লীর সম্রাটের কাছে তাঁদের খুব সমাদর ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ কুতুবুল আলম বখতিয়ারকে দিল্লীর সুলতান বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের উচ্চপদে আসীন করেন।

তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভায় গৌড়ে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান বহুলাংশে বেড়ে যায়। এতে করে কিছু কিছু হিংসুক তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। এ কারণে হযরত কুতুবুল আলম বখতিয়ার দাঁদরা নামক স্থানে চলে যান। হযরত কুতুবুল আলম বখতিয়ারের এক পুত্র ফিরোজ শাহ্ ও এক কন্যা মাইমুনা খাতুন ছিলেন। মাইমুনা খাতুনের গর্ভে এক পুত্র সন্তান মিয়া মল্লিক, তৎপুত্র মিয়া ইব্রাহিম, তৎপুত্র শেখ বন্ধু, তৎপুত্র শেখ আমানুল্লা, তৎপুত্র শেখ নাছের মোহাম্মদ, তৎপুত্র শেখ মোহাম্মদ ফানাহ্। হযরত শেখ মোহাম্মদ ফানাহ্-এর ঘরে হযরত সূফী নিজামপুরী (র) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত শেখ মোহাম্মদ ফানাহ্ (র) একজন ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত পরিবারের সন্তান। তিনি মতান্তরে তাঁর পূর্বপুরুষ দক্ষিণ চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় বসবাস করেছিলেন। তথা হতে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার বর্তমান ফেনী জেলার দাঁদরা পরগণার মজলিশপুরে বসবাস করেন। তথায় হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র) জন্মগ্রহণ করেন বলে লেখকগণ বলে আসছেন।

অবশ্য হযরত নিজামপুরী (র)-এর এদেশ আগমন নিয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। যথা-পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রথমে আজমীর, অতঃপর বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় এবং তথা হতে চট্টগ্রামের নিজামপুর পরগণাধীন এক গ্রামে এসে বসতি স্থাপন

করেন তাঁরই পূর্বপুরুষ। কিন্তু ঐ গ্রাম নদীভাঙনে বিলীন হলে পার্শ্ববর্তী মিঠানালা, যা বর্তমানে মালিআইশ নামে পরিচিত, তথায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

মহান আল্লাহ্‌র যে কোনো ওলী তাঁর জন্ম থেকেই তাঁর উঠাবসা, চালচলনে প্রকাশ পেতে শুরু করে। অনুরূপভাবে হযরত নিজামপুরী (র)-এরও বাল্যকাল থেকেই তাঁর উঠাবসা, চালচলনে উন্নত চরিত্রের ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। সাথে সাথে তাঁর ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি, তাক্‌ওয়া, পরহেজগারী নিয়ে তিনি বড় হতে থাকেন। তাঁর পিতার মতো তিনিও একজন স্বনামধন্য আলেমে দীন ও বিখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বিখ্যাত কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন এবং ফখরুল মুহাদ্দেসীন সনদ লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা মুন্সি গোলাম রহমান মসজিদ সংলগ্ন ঘরে অবস্থান নেন। অবশ্য তিনি হযরত শেখ জায়েদ নামে এক বিখ্যাত দরবেশের হাতে মুরীদ হয়েছিলেন বলে জানতে পারা যায়। কিন্তু তিনি স্বপ্নযোগে হযরত নবী (সা) কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে কলকাতা নগরীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (র)-এর হাতে বাইয়াত হন।

উল্লেখ্য, হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) প্রখ্যাত আলিম ও সাকি হযরত আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর নিকট খিলাফতপ্রাপ্ত হন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কলকাতা অবস্থান নিলে হযরত নিজামপুরী (র) নবীজী কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া স্বপ্নের বাস্তব দানে তাঁর হাতে মুরীদ হন এবং পরবর্তীতে খিলাফত লাভ করেন।

তিনি যৌবনকালের প্রারম্ভ থেকে দিনরাত ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। পরবর্তীতে তরীকতে দাখিল হয়ে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করতে থাকেন।

ঢাকার আজিমপুরে বড় দায়রা শরীফে আল্লাহপাকের মহান ওলী হযরত সূফী সাইয়েদ মোহাম্মদ দায়েম (র) চিরনিদ্রায় শায়িত। তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত সাইয়েদ বখতিয়ার বাগদাদ নগরী হতে সাগরপথে বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম আগমন করেন। হযরত সাইয়েদ দায়েম (র)-এর পিতা হযরত সাইয়েদ আমীন উল্লাহ্‌ (র) চট্টগ্রামের উত্তরাংশে যে স্থানে বসবাস করতেন কোনো কোনো গ্রন্থকার ঐ গ্রামের নাম হাইয়ারা উল্লেখ করেছেন। হযরত সাইয়েদ সূফী দায়েম (র) অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বুজুর্গী চতুর্দিকে বিকশিত হতে থাকে। তাঁর সাথে চট্টগ্রাম মহানগরীতে শায়িত হযরত শাহ্‌ আমানত

(র)-এর নানান অলৌকিক ইতিহাসের কথা রয়েছে। হযরত সূফী সাইয়েদ দায়েম (র) চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা অভিমুখে চলে যান এবং ঢাকার আমলীগোলাস্থ খান মসজিদে অবস্থান করতে থাকেন। তথা হতে তিনি ঢাকার আজিমপুরের গভীর জঙ্গলে অবস্থান গ্রহণ করেন। ঢাকা মহানগরীর বিখ্যাত আজিমপুর দায়েরা শরীফে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

হযরত সূফী নিজামপুরী (র) হযরত সূফী দায়েম (র)-এর বুজুর্গীর সংবাদ শুনে তথায় তশরীফ নিতেন এবং তথায় অবস্থান করতেন। এমনিতে কলকাতা আর চট্টগ্রামের মীরসরাই-এর মধ্যখানে ঢাকার অবস্থান। তবে হযরত নিজামপুরী (র) আজিমপুরে কতবার তশরীফ নিয়েছিলেন তা জানতে পারিনি। সম্ভবত হযরত নিজামপুরী (র) হযরত সূফী দায়েম (র)-এর সুযোগ্য সন্তান ও খলীফা হযরত সূফী সাইয়েদ লকিয়ত উল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পান।

এতে করে কোনো কোনো লেখক হযরত নিজামপুরী (র)-কে হযরত সূফী সাইয়েদ দায়েম (র)-এর মুরীদ বলে মন্তব্য করে থাকেন। তবে হযরত নিজামপুরী (র) পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে মদীনা মুনাওয়ারা অবস্থানকালে নবীজী (সা) কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে দেশে ফিরে কলকাতায় হযরত সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (র)-এর হাতে মুরীদ হন এবং পরবর্তীতে খিলাফত লাভ করেন।

হযরত ওয়াইসী (র) ও হযরত নিজামপুরী (র)-এর সাথে সহযাত্রী হিসেবে অথবা পৃথকভাবে আজিমপুর তাশরিফ নিয়েছিলেন বলে জানতে পারা যায়।

হযরত নিজামপুরী (র)-তাঁর পীর আমিরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর আযাদী আন্দোলনে যোগ দেন এবং অন্যতম দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশ জুড়ে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন। যেহেতু তখন পাঞ্জাবে শিখরা ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের ওপর ধারণাতীত অত্যাচার করতেছিল। এতে করে পাঞ্জাবের পাঞ্জাতারে এক অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর পীর ভাই হযরত ওয়াইসী (র)-এর পিতা হযরত ওয়ারেস আলী (র) শহীদ হন। অতঃপর হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং পাকিস্তানের বর্তমান রাজধানী ইসলামাবাদ ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী মুজাফফরাবাদের মধ্যবর্তী স্থানের ঐতিহাসিক বালাকোট এলাকায় শিখদের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত ব্রেলভীর (র) সৈন্য সংখ্যা

ছিল মাত্র মতান্তরে ৮০০ জনের মতো। কিন্তু প্রতিপক্ষ শিখদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার।

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে শুক্রবার। এই যুদ্ধে আমিরুল মু'মেনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) ও মাওলানা ইসমাইল শহীদ (র)-সহ প্রায় তিনশত জন মুজাহিদ শাহাদাৎবরণ করেন। হযরত ব্রেলভী (র)-এর শাহাদাৎবরণ করার পরমুহূর্তে হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র) মুসলিম কাফেলার তথা মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্বের হাল ধরেন। তিনিও যুদ্ধে আহত হন। কিন্তু হযরত নিজামপুরী (র) যখন যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন তখন যুদ্ধের ময়দানে মহান আল্লাহ্‌প্রদত্ত অলৌকিক শক্তি বারে বারে প্রদর্শিত হতে থাকে। তিনি ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে আহত ও দুর্বল হয়ে পড়েন। মুসলমান কাফেলার এই শোচনীয় অবস্থায় তিনি জীবিত কাফেলাকে সসম্মানে রক্ষা করতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে কলকাতা ফিরে আসেন এবং মুন্সি গোলাম রহমান মসজিদে রাতদিন মহান আল্লাহ্‌পাকের ধ্যানে অতিবাহিত করতে থাকেন। ব্রিটিশরা কলকাতায় বারে বারে হযরত নিজামপুরী (র)-কে গ্রেফতারের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌পাকের মহিমায় হযরত নিজামপুরী (র)-এর কারামতে ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রচেষ্টা বারে বারে ব্যর্থ হতে থাকে।

কলকাতাতে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর তাঁরই প্রিয় পালকপুত্র আবদুল্লাহ্‌কে সাথে নিয়ে চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান মীরেসরাই উপজেলার তৎকালীন নিজামপুর পরগণার মালিআইশ গ্রামে চলে আসেন এবং তথায়ও রাতদিন আল্লাহ্‌পাকের ধ্যানে অতিবাহিত করতে থাকেন। হযরত সূফী সাহেব (র)-এর আগমনে চতুর্দিকে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তিনি যে মহান আল্লাহ্‌পাকের ওলী এবং গাজীয়ে বালাকাট তাও দ্রুত সর্বমহলে প্রকাশ পেয়ে যায়। এই মালিআইশ গ্রামে পরবর্তী জীবন কাটিয়ে তিনি ২৪ রবিউল আউয়াল ১২৭৫ হিজরী, ১ নভেম্বর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, ১৩ কার্তিক ১২৬৬ বাংলায় ইন্তিকাল করেন।

ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর ইঙ্গিত অনুযায়ী তাঁরই অন্যতম মুরীদ মতান্তরে খলীফা মালিআইশ গ্রামের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে মোবারকঘোনার বাসিন্দা হযরত মাওলানা আকরাম আলী (র) তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী তাঁর মাযারের ওপর কোনো ঘর বা গম্বুজ করতে নিষেধ রয়েছে।

এর কয়েক বছর পর তাঁরই প্রিয় পুত্রসমতুল্য আবদুল্লাহ্‌ ইন্তিকাল করেন। তাঁকেও তথায় সমাহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, সম্মানিত পাঠকগণের অবগতির জন্য বালাকোট যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল :

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (র)
হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল দেহলভী (র)
হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র), চট্টগ্রাম
হযরত সাইয়েদ বশরত উল্লাহ্‌ (র)
হযরত হাজী এমদাদ উল্লাহ মহাজেরে মক্কী (র)
হযরত মোহাম্মদ কাশেম নানুতুবী (র), ভারত
হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগোহী (র), ভারত
হযরত ইমামুদ্দীন বাঙালী (র), নোয়াখালী
হযরত মাওলানা মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (র)
হযরত মোঃ মুন্সি ইব্রাহিম (র), চট্টগ্রাম
হযরত মোঃ আহমদ উল্লাহ্‌ (র), চট্টগ্রাম
হযরত মোঃ মুন্সি কলিমুদ্দীন (র)
হযরত মোঃ আহমদ আলী (র)
হযরত মোঃ আবদুল হাকিম (র), চুনতি, চট্টগ্রাম
হযরত মাওলানা মুন্সি ইব্রাহীম (র), নোয়াখালী
হযরত মাওলানা আবদুল আজীজ (র), সিলেট
হযরত মাওলানা মুন্সি মোহাম্মদ আনছারী (র), রাজশাহী
হযরত আবদুল মান্নান বেনারসি (র)

এছাড়া হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (র), হযরত মাওলানা বেলায়েত আলী (র), হযরত মাওলানা এনায়েত আলী (র) তাদের পীর হযরত ব্রেলভী (র)-এর নির্দেশে উপমহাদেশের পূর্বাংশে বিভিন্ন ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন বলে জানতে পারা যায়।

অপরদিকে হযরত সূফী নিজামপুরী (র)-এর খলীফাগণের কোন সুস্পষ্ট তালিকা পাওয়া যায়নি। তবে এটুকু পরিষ্কার যে হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) অন্যতম। অতঃপর হযরত মাওলানা আকরম আলী নিজামপুরী

(র), হযরত খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান (র), হযরত মাওলানা আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র), হযরত মাওলানা গোলাম কাদের (র) ফুরফুরা-ভারত, হযরত মাওলানা আনওয়ার উল্লাহ্ (র), ইসলামাবাদ, হযরত হাফেয ক্বারী মোহাম্মদ ইবরাহীম (র) প্রমুখ তাঁর মুরীদ মতান্তরে খলীফা বলে জানতে পারা যায়।

এখানে উল্লেখ্য, খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান (র) চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে ৯৬ বছর জবরদখলে রেখে গোলাবারুদের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার পর তাঁর জোরালো জিহাদি প্রচেষ্টায় এবং হযরত সূফী নিজামপুরী (র)-এর ফয়েযে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে সক্ষম হন এবং হযরত খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান (র)-এর পীর ভাই হযরত মাওলানা আকরম আলী (র)-কে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার পর প্রথম ইমাম/খতিব হচ্ছেন হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর প্রিয় খলীফা হযরত মাওলানা আকরম আলী (র), মোবারকঘোনা, মীরেসরাই।

এখানে আরও উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম মহানগরীর বিখ্যাত আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে প্রায় ১৩ জন মূল আরবী ও আওলাদে রসূল ইমাম/খতিবের দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত নিজামপুরী-এর খলীফা খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান চট্টগ্রামের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইংরেজরা পর্যন্ত তাঁকে সম্মান করত। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে তাঁদের বিশাল এলাকা জুড়ে জমিদারী ছিল।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষাসহ নানান বিষয়ে তাঁর বহু অবদান রয়েছে। তিনি ফার্সী ভাষার বিশারদ ছিলেন। বাংলা ও ফার্সীতে তাঁর একাধিক দুর্লভ গ্রন্থ রয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান তাঁর পীর হযরত নিজামপুরী (র)-এর ফয়োযতের বরকতে চট্টগ্রাম ইতিহাসের একজন স্মরণীয় বরণীয় বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। এ গ্রন্থের পরবর্তীতে 'সম্পৃক্ত চার ব্যক্তিত্ব' অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

নিজামপুর যে একটি পরগণা কোনো গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা/উপজেলার নাম নয় তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হযরত নিজামপুরী (র)-এর বর্তমান

কবর শরীফের অবস্থান হচ্ছে চট্টগ্রাম জেলার সর্ব উত্তরে মীরেসরাই উপজেলায়। মীরেসরাই উপজেলা সদর ঢাকা-চট্টগ্রাম বর্তমান মহাসড়কের উভয় পাশে এবং এর অবস্থান ঢাকা থেকে প্রায় ১৯৫ কি. মি. দক্ষিণে এবং চট্টগ্রাম মহানগর থেকে ৬০ কি. মি. উত্তরে। তথা হতে মাত্র কয়েকশ' মিটার উত্তরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পশ্চিম পাশে হযরত নিজামপুরী (র)-এর স্মরণে পাকা তোরণ/গেইট রয়েছে। তথা হতে ৪ থেকে ৫ কি. মি. পশ্চিমদিকে রাস্তা দিয়ে গেলে হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর কবর শরীফ ও জামে মসজিদ রয়েছে। এককালে দূর-দূরান্ত থেকে রেলযোগে যাতায়াত সহজতর থাকলেও বর্তমানকালে সড়কযোগে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া অত্যন্ত সহজতর।

হযরত হাজী আবদুল্লাহ্ (র)

হযরত হাজী আবদুল্লাহ্ (র) হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর খেদমতগার ছিলেন। তবে তাঁকে পোষ্য বা পালক পুত্রও বলা হয়ে থাকে। হযরত সূফী সাহেব (র)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর কবর শরীফ দেখাশোনার যাবতীয় দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। হযরত নিজামপুরী (র) তাঁকে লেখাপড়া করিয়ে শিক্ষিত করেছিলেন। তাঁর পীর ভাই খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান (র) ও তাঁর পীর সাহেবের পীর ভাই হযরত ইমামুদ্দীন বাঙালীর সাথে তাঁর দীর্ঘকালীন ঘনিষ্ঠতা ছিল।

বালাকোট যুদ্ধের পর কলকাতায় হযরত নিজামপুরী (র)-এর ওপর ইংরেজদের অতি নজরদারী এবং কলকাতা হতে মীরেসরাই আগমনসহ নানা প্রতিকূলতায় হযরত আবদুল্লাহ্ হযরত নিজামপুরী (র)-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। মীরেসরাই আসার পর হযরত আবদুল্লাহ্ দাম্পত্য জীবনে পা দেন এবং হযরত নিজামপুরী (র)-এর মসজিদের ইমাম ছিলেন।

সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়সহ নানান প্রতিকূলতায় হযরত আবদুল্লাহ্ (র) এই মালিআইশ গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাননি। এমনি এক সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে হাজী আবদুল্লাহ্ তাঁর ঘরে সপরিবারে ইন্তিকাল করেন। এলাকাবাসী হযরত নিজামপুর (র)-এর কবরের পাশে তাঁদেরকে সমাহিত করেন।

খলীফাগণের তালিকা

হযরত সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র)-এর দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবে তাঁর ৩৫ জন সুযোগ্য ও স্বনামধন্য খলীফার তালিকা পাওয়া যায়। হযরত ওয়াইসী (র)-এর ইন্তিকালের পর তাঁরই অতি প্রিয় ও পুণ্যবতী কন্যা হযরত জোহ্‌রা খাতুন (র) এই তালিকাটি তৈরী করেন বলে জানতে পারা যায়।

এখানে উল্লেখ্য, অন্য গ্রন্থে হযরত ওয়াইসী (র)-এর ৩৯ জন খলীফার একটি নামের তালিকা আমার দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ তালিকায় হযরত মাওলানা আবদুল হক, মাইজগ্রাম, মুর্শিদাবাদ-১নং ক্রমিক, হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী, ফুরফুরা, হুগলী-২নং ক্রমিক, হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী-৩ নং ক্রমিক, হযরত মাওলানা একরামুল হক, পুনাশি মুর্শিদাবাদ এইভাবে ৩৯ নং ক্রমিক পর্যন্ত সাজানো আছে। তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু দিওয়ানে ওয়াইসীতে ৩৫ জন বুজুর্গ খলীফার নাম যথাযথ ক্রমিক মতে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এখানে প্রদত্ত হলো :

১. হযরত মাওলানা আবদুল হক (র), গ্রাম ও পোঃ সীজগ্রাম, জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

২. হযরত মৌলভী আইয়াজ উদ্দীন (র), আলীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৩. হযরত সূফী নিয়াজ আহমদ (র), কাতরাপোতা, জেলা-বর্ধমান, ভারত।

৪. হযরত সূফী একরামুল হক (র), পুনাশি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

৫. হযরত মৌলভী মতিয়ুর রহমান (র), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

৬. হযরত হাফেয মোঃ ইব্রাহীম (র), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

৭. হযরত মৌলভী আবদুল আজিজ (র), চন্দ্র জাহানাবাদ, জেলা-হুগলী।

৮. হযরত মৌলভী আকবর আলী (র), সিলেট, বাংলাদেশ।

৯. হযরত মৌলভী আমজাদ আলী (র), ঢাকা, বাংলাদেশ।

১০. হযরত মৌলভী আহমদ আলী সুরেশ্বরী (র), সুরেশ্বর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ।

১১. হযরত দিদার বখশ (র), পদ্মপুকুর, জেলা-হাওড়া, ভারত।

১২. হযরত শাহ বাকিউল্লাহ্ (র), কানপুর, জেলা-হুগলী, ভারত।

১৩. হযরত মৌলভী আবূ বকর সিদ্দিকী (র), ফুরফুরা, জেলা-হুগলী, ভারত।

১৪. হযরত শামসুল ওলামা সূফী গোলাম সালমানী (র), ফুরফুরা, ভারত।

১৫. হযরত মৌলভী গনিমত উল্লাহ্ (র), ফুরফুরা, ভারত।

১৬. হযরত মুন্সী সাদাকাত উল্লাহ্ (র), ফুরফুরা, ভারত।

১৭. হযরত মুন্সী শারাফাত উল্লাহ্ (র), খাতুন, জেলা-হুগলী, ভারত।

১৮. হযরত শেখ কোরবান আলী (র), বানিয়া তালাব, কলকাতা, ভারত।

১৯. হযরত শামসুল ওলামা মৌলভী মির্জা, আশরাফ আলী (র), কলকাতা।

২০. হযরত সাইয়েদ ওয়াজেদ আলী (র), মেহদীবাগ, কলকাতা।

২১. হযরত মৌলভী গুল হুসাইন (র), খোরাসান, আফগানিস্তান।

২২. হযরত মৌলভী আতাউর রহমান (র), চব্বিশ পরগনা, ভারত।

২৩. হযরত মৌলভী মুবিনুল্লাহ্ (র), রামপাড়া, জেলা-হুগলী, ভারত।

২৪. হযরত মৌলভী সাইয়েদ যুলফিকার আলী (র), টিটাগড়, জেলা-চব্বিশ পরগনা, ভারত।

২৫. হযরত মৌলভী আতায়ে এলাহি (র), মঙ্গলকোট, জেলা-বর্ধমান, ভারত।

২৬. হযরত মুন্সী সুলায়মান (র), জেলা-চব্বিশ পরগনা, ভারত।

২৭. হযরত মৌলভী নাছিরুদ্দীন (র), জেলা-নাদিয়া, ভারত।

২৮. হযরত মৌলভী আবদুল কাদের (র), ফরিদপুর, বাংলাদেশ।

২৯. হযরত মৌলভী কাজী খোদ নাওয়াজ (র), দাহসা, জেলা-হুগলী, ভারত।

৩০. হযরত মৌলভী আবদুল কাদের (র), বৈদ্যবাটি, জেলা-হুগলী, ভারত।

৩১. হযরত কাজী ফাসাহতুল্লাহ্ (র), চব্বিশ পরগনা, ভারত।

৩২. হযরত শেখ লাল মোহাম্মদ (র), চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, ভারত।

৩৩. হযরত মৌলভী সাইয়েদ আযম হুসাইন (র), অবস্থান-মদীনা শরীফ।

৩৪. হযরত মৌলভী মোহাম্মদ সাইয়েদ ওবায়দুল্লাহ্ (র) শান্তিপুর, জেলা-নদিয়া, ভারত।

৩৫. হযরত মৌলভী হাফেয মোঃ ইব্রাহীম সাহেব (র), ফুরফুরা, জেলা-হুগলী।

উল্লেখ্য, উক্ত ৩৫ জন মহান আল্লাহর ওলী খলীফাগণের মধ্যে ৫নং ক্রমিক হযরত মাওলানা মতিউর রহমান ও ৬নং ক্রমিক হযরত হাফেয মোহাম্মদ ইব্রাহিম (র) চট্টগ্রামের বাসিন্দা বলে উল্লেখ করা আছে। এই তালিকাটি ভারত থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে বারে বারে আমার নজরে আসে। এতে করে হযরত ওয়াইসী (র)-এর চট্টগ্রামের এই দুই মহান খলীফার ঠিকানা, অবস্থান, মাযার শরীফ জানতে সচেষ্ট হই। কিন্তু আমি এতে কোন তথ্য লাভ করতে অক্ষম। তবে আমার ধারণা মীরেসরাই উপজেলায় এই দুই মহান ওলীর কবর শরীফ/মাযার রয়েছে, যা হয়ত সর্বমহলে অজ্ঞাত।

ক'জন খলীফার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হযরত ওয়াইসী (র)-এর সুযোগ্য ও স্বনামধন্য বিখ্যাত খলীফাগণের তালিকার দিকে নজর দিলে অনায়াসে ধারণা করা যায় হযরত ওয়াইসী (র) মহান আল্লাহ্‌পাকের কত বিখ্যাত ওলী ছিলেন। বিশ্বের বুকে না বললেও অন্তত এই উপমহাদেশের ইতিহাসে এই রকম মহান ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্ পাকের ওলী খলীফা রেখে যাওয়া হযরত ওয়াইসী (র)-এর মতো আর দুই-একজন পাওয়া যাবে কিনা বলা মুশকিল। তবে তাঁর মহান খলীফাগণের মধ্যে বহু প্রচেষ্টার পর মাত্র কয়েকজনের ওপর ন্যূনতম ধারণা লাভ করতে পারি এবং তা সংক্ষিপ্ত আকারে সম্মানিত পাঠক মহলে উপস্থাপন করলাম।

হযরত মাওলানা আবদুল হক সিদ্দিকী (র)

মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

হযরত মাওলানা আবদুল হক সিদ্দিকী (র) তালিকাভুক্ত ৩৫ জন খলীফাগণের মধ্যে ১ নম্বরে রয়েছেন। তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর বংশধর বলে জানা যায়। তিনি আরবী ও ফার্সি উভয় ভাষাতে যেমনি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তেমনি উভয় ভাষায় অনর্গল পড়তে ও বলতে পারতেন। তিনি প্রায় সময় নিজ পীরের সাহচর্যে থাকতে সচেষ্ট থাকতেন এবং নিজ পীরের অনুকরণে অনুসরণে তিনিও বিভিন্ন গযল, কাসিদা লেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর বহু মুরীদ ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ, ১১ রবিউল আউয়াল ১৩০৬ হিজরী ইন্তেকাল করেন। মুর্শিদাবাদে পুনাশির পার্শ্বে সীজ গ্রামের এইস, এস, টি হাই স্কুলের দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্বে কবরস্থানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত।

হযরত সূফী একরামুল হক (র)

মুর্শিদাবাদ, পুনাশি, ভারত

হযরত সূফী একরামুল হক (র) তাঁর মহান পীরের মুর্শিদাবাদস্থ একই এলাকায় বসবাসকারী ছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি শৈশবকাল থেকে তাঁর মহান পীরের সান্নিধ্যে আসেন। তরীকতে দাখিল হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের হযরত সূফী সাইয়েদ মোরশেদ আলী আল কাদেরী (র)-এর নিকট সময় অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁরই নির্দেশে তিনি হযরত

ওয়াইসী (র)-এর সান্নিধ্যে ফিরে আসেন এবং মুরীদ হন। ফলশ্রুতিতে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের গভীরে চলে যেতে থাকেন এবং খিলাফত লাভ করেন। তিনি আসামের বনে-জঙ্গলে একটানা ১২ বছর নিবিড় ধ্যানমগ্নে অতিবাহিত করেন। ঐ সময় বনের হিংস্র জীবজন্তুরা তাঁকে ঘিরে থাকত। তিনি তথায় বহু সাধকের সংস্পর্শে আসেন। আসামসহ ভারতে তাঁর অসংখ্য মুরীদ রয়েছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার হলদী বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত।

তথায় তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ৯ রমযান রোযা থাকাবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তথায় তাঁর প্রকাণ্ড মাযার রয়েছে। আজও বাৎসরিক লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে তাঁর ইছালে সওয়াব মাহ্‌ফিল হয়। বাংলার উত্তরে, আসামে, বিহারে তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদ ও বহু খলীফা রয়েছে। হযরত সূফী একরামুল হকের নাতি (পৌত্র) খন্দকার মাওলানা সূফী জিয়াউল হক সাইয়েদ মসউদুর রহমানের কন্যা সাইয়েদা হোসনে আরা খাতুনকে বিবাহ করে পুনাশি হযরত ওয়াইসী (র)-এর ঘরে বসবাস করতেছেন।

হযরত মাওলানা আকবর আলী (র)

সিলেট, বাংলাদেশ

হযরত মাওলানা সূফী সাইয়েদ আকবর আলী (র) সিলেট জেলার গোপালগঞ্জের রণকোলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর সাথে তাঁরই পীর ভাই হযরত মাওলানা সূফী সাইয়েদ আমজাদ আলী (র)-এর সাথে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি সিলেটে ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতা গমন করেন। অতঃপর বিখ্যাত কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার মুদাররিস (শিক্ষক) পদে যোগদান করেন এবং কলকাতা নগরীতে হযরত ওয়াইসী (র)-এর সংবাদ পেয়ে তাঁর হাতে মুরীদ হন। এতে করে তিনি শরীয়তের খেদমতের পাশাপাশি তরীকতের কাজ চালিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে অতি উচ্চাঙ্গে পৌঁছে যান। এর ফলে হযরত ওয়াইসী (র) তাঁকে খিলাফতদানে ভূষিত করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে শরীয়ত ও তরীকতের খেদমতের পাশাপাশি বহু কারামত রয়েছে।

তিনি সিলেটে ইন্তেকাল করেন। সিলেট জেলার অন্তর্গত ছোট একটি পাহাড়ি টিলায় তাঁর কবর শরীফ রয়েছে।

হযরত মাওলানা আমজাদ আলী (র)

নবাবগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা, বাংলাদেশ

হযরত মাওলানা সূফী সাইয়েদ আমজাদ আলী (র) ১০ মহররম ১২৭৭

হিজরী, ১২৬৫ বাংলা ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত কাজী সাইয়েদ এনায়েত উল্লাহ্। মাত্র ৮ বছর বয়সে তিনি কুরআন শরীফ শিক্ষা শেষ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি ঢাকার বিখ্যাত সূফী মাওলানা দীন মোহাম্মদ সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভের জন্য তাঁর পিতা কর্তৃক প্রেরিত হন। ছোটকাল থেকে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, তাকওয়া, পরহেজগারী সর্বমহলে প্রকাশ পেতে শুরু করে। ঢাকা থেকে তিনি কলকাতা গিয়ে বিখ্যাত কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তখন থেকে তিনি হযরত ওয়াইসী (র)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তরীকতে দাখিল হন। এতে করে তিনি মারিফতের সাগরে বিচরণ করতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তিনি হযরত ওয়াইসী (র) থেকে খিলাফত লাভ করে ধন্য হন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে শরীয়ত ও তরীকতের খেদমতের পাশাপাশি বহু কারামত রয়েছে। তিনি ৩২ আষাঢ় ১৩১৯ বাংলা ৫২ বছর ১১ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। বৃহত্তর ঢাকার নবগঠিত মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান উপজেলার অন্তর্গত পাওশারে চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়ার সময় তিনি পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা রেখে যান।

হযরত মাওলানা সূফী আহমদ আলী সুরেশ্বরী (র)

শরীয়তপুর, বাংলাদেশ

হযরত মাওলানা সূফী আহমদ আলী সুরেশ্বরী (র) বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার নবগঠিত শরীয়তপুর জেলার নুড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মৌলভী মেহের উল্লাহ্ (র)। তিনি নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলকাতা গমন করে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং একান্ত মনে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কলকাতায় অবস্থানকালে হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (র)-এর সাক্ষাৎ লাভে সৌভাগ্যবান হন। যেহেতু কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার নিকটে হযরত ওয়াইসী (র)-এর খানকাহ্-এর অবস্থান ছিল। এতে করে তিনি তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তরীকতের তালিম নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজের পীর সাহেবের খানকায় সময় ব্যয় করতেন। যৌবনকালে তিনি খিলাফত লাভ করেন। তিনি মাদ্রাসায় উচ্চতর পরীক্ষায় প্রথম হন এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে হেড মাওলানা হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ফলশ্রুতিতে সারা ভারতে তাঁর পরিচিতি ও মর্যাদা বিকশিত হয়। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর (১৮৯২-১৯১২) কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা পদে আসীন

ছিলেন। তিনি ৯টি বড় মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। (১) শিরকে হক জামে নূর (২) লাতায়েফা সাফিরা (৩) সাফিনায়ে সফর (৪) নূরে হক গঞ্জে নূর (৫) মাতলাউল উলুম (৬) কৌলুল কেরাম (৭) সরহে সদর (৮) আইনাইন (৯) মদিনা কলকি অবতারে সাফিনা। এই মহান আল্লার ওলী ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ ২ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ বাংলা ইন্তিকাল করেন। তিনি সুরেশ্বরে চিরনিদ্রায় শায়িত।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ সূফী আহমদ আলী সুরেশ্বরী (র)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত মাওলানা সাইয়েদ সূফী আবদুল হাই (র) প্রকাশ সাইয়েদ নূর শাহ (র)-কে খিলাফত দানে ভূষিত করেন। তিনিও কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। আরবী ও বাংলার পাশাপাশি ফার্সী, ইংরেজী, উর্দু ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ১৩৬১ বাংলার ৫ ভাদ্র মোতাবেক ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ ২২ আগস্ট সুরেশ্বরে ইন্তিকাল করেন।

তিনি ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত মাওলানা সূফী সাইয়েদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদী নূরীকে খিলাফত দানে ভূষিত করেন।

হযরত দিদার বখশ (র)

হাওড়া, কলকাতা, ভারত

কলকাতা নগরীতে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত। ঐ এলাকায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি ছিলো। তার কবরের পার্শ্বে তাঁরই নামকরণে অর্থাৎ মাদ্রাসা দিদারিয়া নামকরণে একটি মাদ্রাসা রয়েছে। পদ্মপুকুর, মাদ্রাসা দিদারিয়া, ৮২ কারী রোড, হাওড়া-৭১১১০৪ এই ঠিকানা তথায় লেখা আছে। তাঁর মুবারক জীবনের ওপর কোন তথ্য তালাশ করে পাইনি।

হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (র)

ফুরফুরা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (র) হুগলী জেলার বিখ্যাত ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা আবদুল মোখতার সিদ্দিকী (র)। তাঁর মাতার নাম মোসাম্মৎ মহাব্বতীন নিসা (র)।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (র) আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর বংশধর বলে জানতে পারা যায়। মাত্র ৯ মাস বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। এতে করে তাঁর জন্মদাত্রী আম্মাজানের পাশাপাশি নিকট আত্মীয়-স্বজন তাঁর প্রতিপালনে এগিয়ে আসেন। তিনি নিজ গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ফুরফুরাস্থ সীতাপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষাজীবন শুরু করেন। অতঃপর তিনি হুগলীস্থ মুহসেনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। তিনি

কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে কলকাতা শহরে সিদরেপট্টি জামে মসজিদে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের বিশেষ তালিম নেন। তখন তাঁর সাথে কলকাতার বিখ্যাত নাখোদা মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা বেলায়েত হোসেনের সাথে যোগাযোগ থাকত। কলকাতা অবস্থানকালে তিনি হযরত ওয়াইসী (র)-এর খেদমতে হাজির থাকতেন এবং মুরীদ হন। এতে করে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে অতি উচ্চাঙ্গে পৌঁছে যান। তিনি নিজের পীরকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করতেন তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। তিনি নিজের পীর কর্তৃক নির্দেশিত না হওয়া পর্যন্ত না বসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর পীর বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমালে তিনি নিকটে ইট মাথায় দিয়ে ঘুমাতেন। নিজের পীরের প্রতি এই রকম নানান অসাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধার নজির তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়।

তিনি দীর্ঘ সময় ধরে নিজ পীরের সান্নিধ্যে থেকে শরীয়তের পাশাপাশি তরীকতের তথা আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতর আসনে পৌঁছে যান।

তাঁর পীর হযরত ওয়াইসী (র)-এর ইন্তিকালপূর্ব শেষ সফরে এবং ইন্তিকালের সময় তাঁর নিকটে ছিলেন। মোটকথা, তাঁর যৌবনের শুরু থেকে নিজ পীরের ইন্তিকাল পর্যন্ত পীরের সান্নিধ্যে থাকাটাকে তিনি নিয়ামত হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

তিনি পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে এই উপমহাদেশে বহু মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরিধি এত বিশাল যে তা ধারণার বাইরে।

তিনিও জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর ওলী ও খলীফাগণ রেখে যান। আমাদের বাংলাদেশের বৃহত্তর বরিশালের শরষীনার হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন (র) তাঁর অন্যতম খলীফা। এদেশের বিশাল ও বিখ্যাত শরষীনা আলিয়া মাদ্‌রাসা হযরত নেছার উদ্দিন (র)-এর অমর কীর্তি এবং ফুরফুরার পাশাপাশি শরষীনা থেকেও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (র)-এর আরেক অন্যতম খলীফা হলেন চট্টগ্রামের মীরেসরাইয়ের হযরত মাওলানা আবদুল গনী (র)। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সূফীয়া নূরীয়া মাদ্‌রাসাকে কেন্দ্র করে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর পীর সাহেব ফুরফুরা থেকে চট্টগ্রামের মীরেসরাই তাশরীফ আনলে পর ফুরফুরার হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এই মাদ্‌রাসাকে তাঁর দাদা পীর হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর নামকরণে সূফীয়া নূরীয়া মাদ্‌রাসা নামকরণ করেন। হযরত নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর কবর শরীফের কয়েকশ' মিটার পশ্চিমে এই সূফীয়া নূরীয়া মাদ্‌রাসার অবস্থান। চট্টগ্রাম মহানগরীতে

প্রতিষ্ঠিত নেছারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা অবস্থিত। হযরত মাওলানা আবদুল গনী (র)-এর মুরীদ হযরত মাওলানা মোজাফ্‌ফর আহমদ (র) তাঁর পীর সাহেবের পীর ভাই শরষীনা পীর সাহেবের নামকরণে এবং তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ্ (র)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করান।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

বাংলা পেরিয়ে উপমহাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি ফুরফুরার হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর অন্যতম খলীফা হন।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এককালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ ডিগ্রীর জন্য প্যারিসে গমন করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তথায় যোগদান করেন। তবে তিনি কিছুদিন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন বলে জানতে পারা যায়। তিনি ২৮৫টি গ্রন্থের রচয়িতা এবং বিশ্বের ২৪টি ভাষায় বিশারদ। তন্মধ্যে বাংলা, আরবী, ইংরেজী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, মারাঠি, তামিল, আসামী, উড়িয়া, জার্মান, তিব্বতী, পালি, সংস্কৃত, সিংহলী, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন উল্লেখযোগ্য।

তিনি হযরত ওয়াইসী (র)-এর "দিওয়ানে ওয়াইসী"-এর কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ্ হল তাঁর অমর স্মৃতি। ঐ হল সংলগ্ন মোঘল ট্রেডিশনের মসজিদ রয়েছে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকালের পর ঐ মসজিদের পশ্চিম পাশে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর সিলসিলাভুক্ত এই মহান ব্যক্তি অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তা সর্বজন স্বীকৃত।

হাফেজুল হাদীস হযরত মাওলানা হাতেম আলী (র) নোয়াখালী, হযরত সূফী সদর উদ্দিন (র) ফেনী, হযরত মাওলানা রুহুল আমীন (র) যশোর, হযরত মাওলানা সূফী তাজাম্মুল হোসেন সিদ্দিকী (র), অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী খান বাহাদুর আবদুর রহমান (র) এবং তাঁর দুই পুত্রসন্তান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর খলীফা বলে জানতে পারি। এখানে উল্লেখ্য, ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে তাঁর অনেক স্বনামধন্য বিখ্যাত খলীফা ও মুরীদ রয়েছেন।

শামসুল ওলামা হযরত সূফী মাওলানা গোলাম সালমানী (র)

ফুরফুরা, ভারত

হযরত মাওলানা সূফী গোলাম সালমানী (র) ১২৭০ হিজরীর ৫ শাওয়াল,

১২৫১ বাংলার ১৭ আষাঢ়, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার বিখ্যাত ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি অত্যন্ত সমঝদার ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং মেধাবী ছিলেন।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় ফুরফুরা শরীফ এবং হুগলীতে। পরে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা যান এবং খ্যাতনামা কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি তফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ্‌, উসুলে ফিক্‌হ, আকাঈদ, মানতিক, হেকমত, বালাগাত বিশেষত আরবী, ফার্সি এবং ইসলামী ইতিহাসে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। হযরত মাওলানা আহমদ আলী ছাহারনপুরী (র) থেকেও ফয়েজ প্রাপ্ত হন।

তিনি কর্মজীবনের প্রারম্ভে হুগলী গভর্নমেন্ট মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে তথা হতে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় বদলী হয়ে আসেন।

তিনি অন্যতম কামেল ওলী হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (র)-এর অন্যতম বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনার সময় মাদ্‌রাসার পূর্ব দিকে বিবি সালেট মসজিদে নিজের পীর সাহেবের অনুকরণে তাঁর মুরীদগণকে তরীকতের তালিম প্রদান করতেন।

উল্লেখ্য, হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) এই বিবি সালেট মসজিদে বসে শরীয়ত ও তরীকতের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

তাঁর পীর সাহেব হযরত ওয়াইসী (র)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তিনি নিকটে না থাকায় বারে বারে তাকে খুঁজতেছিলেন।

তাঁর পদোন্নতি সাপেক্ষে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে হুগলী মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসার হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও ইলমের প্রেক্ষিতে গভর্নমেন্ট তাঁকে "শামসুল ওলামা" পদে ভূষিত করেন। তিনি শরীয়ত ও তরীকতের খেদমতের পাশাপাশি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনুমতি ব্যতীত কাউকেও সাক্ষাৎকার দিতেন না। বাংলায় তখনকার সময়ের গভর্নমেন্ট ও নন-গভর্নমেন্ট বড় বড় ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যিনি তাঁকে সমীহ করতেন না। তিনি দৈনিক ৪/৫ হাজার লোককে মোলাকাত, শরীয়ত ও তরীকতে তালীম দান করতেন যা সত্যি বিস্ময়ের ব্যাপার।

তিনি ছুটির দিনের বেতন গ্রহণ করতেন না এমন কি সাপ্তাহিক ছুটির (রবিবার) বেতনও গ্রহণ করতেন না। মহান ওলী শামসুল ওলামা হযরত মাওলানা

সূফী গোলাম সালমানী (র) ১৭ আষাঢ় ১৩১৯ বাংলা, ১৫ রজব ১৩২০ হিজরী, ১ জুলাই ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বিকেল ৫টায় হুগলী শহরে কিটকিঘাট এর নিকটবর্তী হাকীম আবদুল করিম সাহেব-এর ঘরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর লাশ মোবারক ফুরফুরা শরীফে নিয়ে দাফন করা হয়। ফুরফুরাতে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (র)-এর অন্যতম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (র) ও ফুরফুরাতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। উভয়ে আপন মামাত-ফুফাত ভাই এবং উভয়ের কবর শরীফ প্রায় কয়েকশ মিটারের ব্যবধানে।

বস্তুতঃ উভয়ে আপন মামাতো-ফুফাতো ভাই হলেও তরীকতে খেদমতের দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন-হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (র)-এর তখনকার আমলে লক্ষ লক্ষ মুরীদ ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। সাথে সাথে বাংলা পেরিয়ে উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাঁর অসংখ্য স্বনামধন্য খলীফা রয়েছে। অপরদিকে শামসুল ওলামা হযরত সূফী গোলাম সালমানী (র) একজন বুজুর্গ পীর হয়েও তিনি মনে হয় পীরের মুরীদের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন না। এতে করে তাঁর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কোন খলীফা বা মুরীদ তথ্য তালাশ করতে গিয়েও পাইনি। বাণ্ডেলে চিরনিদ্রায় শায়িত হযরত সূফী সৈয়দ আবদুল বারী (র) বাদে তাঁর দ্বিতীয় কোনো খলীফার সন্ধান পাইনি। এমনকি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গমন করেও তাঁর খলীফার তালিকাতো নয়ই দ্বিতীয় কোনো খলীফার সন্ধানও পাইনি। তবে বিভিন্ন গ্রন্থ ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে তাঁর বিখ্যাত কয়েকজন মুরীদের সন্ধান পাই। তাঁরা হলেন :

খান বাহাদুর আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক, বেঙ্গল।
নবাব সিরাজুল ইসলাম, কুমিল্লা, বাংলাদেশ।
নবাব সুলতান আহমদ, টালীগঞ্জ, কলকাতা।
খান বাহাদুর আমিনুল ইসলাম, বেঙ্গল।
সূফী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আসাম।

তাঁর ইন্তিকালে তখনকার এক নামকরা ফার্সি কবি একটি শ্লোক গাথা রচনা করেছিলেন। তার সারমর্ম এই :

আফসোস! সে পূত ও পবিত্র স্বভাব আলিম দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

আফসোস! দীনদার ও ধর্মপরায়ণ সমাজের শিরোমণি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

আফসোস! দীনের সূর্য পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে গেছে।

আফসোস! দিবা ও রাত্রি হতে আল্লাহ্ তা'আলার সে নূর তিরোহিত হয়ে গেল।

আফসোস! সে মারিফাতের ভাণ্ডার জমীনের নীচে সমাহিত হয়ে গেল।

আফসোস! যুগের অধিবাসীগণ এক মহা সম্পদ হারাল।

আফসোস! জমানার গাউছ, আউলিয়াকুলের দিশারী মহা সম্মানের সাথে উচ্চতর বেহেশতে তশরীফ নিয়ে গেলেন।

আফসোস! আমাদের উজ্জ্বল দিবালোক শোকজনিত অন্ধকার রজনীতে পরিণত হলো।

হযরত সাইয়েদ আবদুল বারী (র)

বাণ্ডেল, হুগলি, ভারত

হযরত সাইয়েদ আবদুল বারী (র) হযরত সূফী মাওলানা গোলাম সালমানীর অন্যতম খলীফা ছিলেন। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার বাণ্ডেল রেল স্টেশনের নিকটে জামে মসজিদ সংলগ্ন চিরনিদ্রায় শায়িত। তিনি মুজাদ্দিদে-জামান এবং আওলাদে রাসূল ছিলেন। তিনি যে মহান আল্লাহ্পাকের ওলী ছিলেন তা তাঁর জন্ম থেকেই ভেসে উঠতে ছিল। তিনি যাচাই না করে কাউকেও মুরীদ করতেন না। এই মহান আওলাদে রাসূল মাত্র ৪০ বছর বয়সে ১৯০১ সালের দিকে ইন্তিকাল করেন।

হযরত সাইয়েদ আবদুল বারী (র)-এর কয়েকটি বাণী এখানে উল্লেখ করা গেল।

তাসাউফের প্রকৃত তত্ত্ব সম্প্রসারণ করে তিনি ইরশাদ করেছেন, তাসাউফ আসলে নিমগ্নতা ও 'এহসানের' দ্বিতীয় নাম।

শরীয়ত ও তরীকতের পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে ইরশাদ করেন, শরীয়তের নাম হলো ভ্রমণ করা জাহির হতে বাতিনের দিকে এবং তরীকতের নাম হলো ভ্রমণ করা বাতিন হতে জাহিরের দিকে।

পীর-মুরীদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন, পীর-মুরীদি অন্য লোকের কাজ, আমার কাজ হলো, আল্লাহ্র তালিবকে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে দেয়া।

কারামত সম্পর্কে ইরশাদ করেন, মুরদাকে জিন্দা করা বড় কারামত নয়, বড় করামত হলো দোজখীকে বেহেশতি বানিয়ে দেয়া।

ওরশ সম্বন্ধে ইরশাদ করেন, মাগরিবের সময় যে ফাতেহা পাঠ করে তা-ই ওরশ।

'রেয়াজত' ও 'মোজাহাদার' বিষয়ে ইরশাদ করেন, এখন আর কঠোর রেয়াজতের প্রয়োজন নেই বরং বসে বসে ফয়েজের অপেক্ষা করা।

হযরত আজমগড়ী (র)

ঘোন্ডা, উত্তর প্রদেশ, ভারত

হযরত সাইয়েদ আবদুল বারী (র)-এর অন্যতম মুরীদ ও খলীফা হযরত মাওলানা হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (র)। ভারতের উত্তর প্রদেশের বিভাগীয় শহর ঘোন্ডা নগরীতে চিরনিদ্রায় শায়িত। তিনি ইলমে লাদুন্নির অধিকারী ছিলেন। তিনি ১৮৭১ মতান্তরে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার কোহান্ডায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বছরে একবার শরীয়ত ও তরীকতের খেদমতের উদ্দেশ্যে বার্মার (মায়ানমারের) পাশাপাশি চট্টগ্রাম সফর করতেন। তিনি তাঁর পীর সাহেব হযরত সাইয়েদ আবদুল বারী (র)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর দাদা পীর হযরত মাওলানা সূফী গোলাম সালমানী (র)-এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তাঁর পীর সাহেব হযরত সাইয়েদ সাহেব হুজুর ইন্তিকাল করায় তাঁর দাদা পীর হযরত সূফী গোলাম সালমানী (র) তাঁর অন্যান্য মুরীদের চেয়ে হযরত আজমগড়ী (র)-কে বিশেষ মূল্যায়ন করতে লাগলেন। এমনকি তাঁর সাথে সাক্ষাতের পূর্বানুমতির যে কঠোর নিয়ম ছিল হযরত আজমগড়ী (র)-এর ক্ষেত্রে তা শিথিল করে দিলেন। এই মহান আল্লাহ্র ওলী ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি উত্তর প্রদেশের বিভাগীয় শহর ঘোন্ডায় ইন্তিকাল করেন। তথায় তিনি অনাড়ম্বরভাবে চিরনিদ্রায় শায়িত।

হযরত আজমগড়ী (র)-এর উপদেশসমূহ

আমরা প্রশংসা করছি আল্লাহ্ পাকের এবং দরূদ পাঠ করছি তাঁর দয়ালু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওপর।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর পথে উসিলা অন্বেষণ কর ও তাঁর দীনের পথে অব্যাহতভাবে নিরলস চেষ্টা কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের নিকট কবুলিয়তের (গ্রহণীয় হওয়ার) ও তাঁর বন্ধুত্বের (প্রিয় বান্দাহ হওয়ার) কিছু মূলনীতি রয়েছে যদ্বারা উচ্চ মর্যাদা অর্জনের লক্ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সজ্জিত হওয়া এবং কিছু অকৃতকার্যতা ও হতাশার কারণও আছে যেগুলো হতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের বেঁচে থাকা ও নিবৃত্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সকল প্রকার উর্ধ্বারোহণের প্রারম্ভের মূল উৎস খোদাভীরুতা। মানুষের মধ্যে যদি আল্লাহ্‌ভীতি বিদ্যমান না থাকে তাহলে কোনো প্রকারের কবুলিয়তই সম্ভব নয়।

আল্লাহপ্রেম, উন্নতি এবং উর্ধ্বারোহণের লক্ষ্য ও মূল উৎস, যা আল্লাহ্ প্রেমিকের সাহচর্যে (সোহবতের মাধ্যমে) সহজে প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

আন্তরিকতা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং এতেয়াতের জযবা হতে আমলের আরম্ভ হওয়া বাঞ্চনীয়। যদি এ সমস্ত জিনিস (গুণ) অপ্রাপ্য হয় বা লুপ্ত হয়ে থাকে তাহলে যারা এ সমস্ত মহৎ গুণে গুণান্বিত তাদের ছোহবতে তা লাভ হতে পারে।

সুন্নত অনুসরণ ও মাসূরা আদায়ে ব্রতী হওয়ার সাথে সাথে (হালাল উপার্জনের লক্ষ্য) শ্রম ও দীনের কাজে মোজাহাদা (নিরলস চেষ্টা) উন্নতির পথ খুলে দেয় এবং ত্রুটিসমূহ দূরীভূত করে। আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার লক্ষ্যে নির্জনতা অপরিহার্য। এর দ্বারা হালে মোকাম (স্থায়ী অবস্থা) তৈরী হতে পারে।

ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বের ফৌজ সুশৃংখল হয়ে থাকে।

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি সমস্ত ত্রুটির উৎস যা হতে নিবৃত্ত হওয়া অপরিহার্য।

অনৈক্য জমিয়তকে বিক্ষিপ্ত (বিভক্ত) করে দেয় সুতরাং তা থেকে বেঁচে চলা (পরিহার করা) অপরিহার্য। নিজেদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ থাকলে তা নীরবে অনুসন্ধান করা উচিৎ এবং যে ভুল করেছে তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বুঝাতে হবে যেন অনৈক্য বাড়তে না পারে ও নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বে কোনো প্রকার বিশৃংখলা না আসে।

খেলাফতের (প্রতিনিধিত্ব তথা নিয়ামতের) দায়িত্ব অর্পণে উপযুক্ততার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। কেবলমাত্র পৈতৃক উত্তরাধিকারীকে ভিত্তি করলে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়ে যাবে।

সূফীগণের নেসবত পূর্ণরূপে অর্জনের লক্ষ্যে নেসবতধারীগণকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ও সমীহ করা অপরিহার্য।

আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হওয়ায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়। অনেক ক্ষেত্রে পদাঙ্ক অনুসরণ শ্রেয় যার ফলে জান্নাতুল ফিরদাউস নছীব হয় ও দীদারে খোদা হাসিল হয়।

সিলসিলার অনুসারীদের উচিত তারা যেন সমসাময়িকগণের মধ্যে ভুল ধারণাসমূহের ফলে স্পর্শকাতর ভাবাপন্ন না হয়। নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার রাখবে এবং নিজেকে ইমামুত তরীকত হযরত সাইয়েদ আবদুল বারী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের মুরীদ মনে করবে, কেননা এতে অগণিত (বেশুমার) ফায়দা রয়েছে। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

উপমহাদেশ ব্যাপী খলীফাগণের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলেও তাঁর স্বনামধন্য ও বিখ্যাত খলীফা রয়েছেন তৎমধ্যে গারাংগিয়া হযরত বড় হুযূর (র), তাঁরই সহোদর ছোট ভাই হযরত ছোট হুযূর (র), চট্টগ্রাম মহানগরীর হালিশহরস্থ হযরত হাফেজ মুনিরুদ্দিন (র), দক্ষিণ চট্টগ্রামের চুনতিস্থ হযরত মাওলানা ফজলুল হক (র) ও হযরত মাওলানা নজীর আহমদ (র) এবং হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরকানি (র) অন্যতম।

গারাংগিয়া হযরত বড় হুযূর (র)

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

হযরত আজমগড়ী (র)-এর অন্যতম খলীফা কুতুবুল আলম সুলতানুল আউলিয়া হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মজিদ (র) (গারাংগিয়া হযরত বড় হুযূর (র) ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার গারাংগিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ বুযুর্গ পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর পার্শ্ববর্তী মির্জাখীল গ্রামের হযরত মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আবদুল হাই (হযরত সাহেব) ও হযরত মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেবের নিকট পরবর্তী ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন।

অতঃপর তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামের কালারপোল মাদ্‌রাসায় কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করে চট্টগ্রাম মহানগরীর দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তথায় কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া সমাপ্ত করেন।

দারুল উলুম মাদ্‌রাসার উস্তাদগণের উপদেশে তিনি ঐ পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম সংলগ্ন অপর পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত চিটাগাং মাদ্‌রাসা (মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসা) ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে ঐ মাদ্‌রাসা বিলুপ্ত হয়ে হাজী মুহাম্মদ মোহসীন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত।

চট্টগ্রাম শহরে অবস্থানকালে ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ হতে তাঁর তাক্‌ওয়া, পরহেজগারী, বুযুর্গী ওস্তাদ, ছাত্র, এলাকার সর্বমহলে প্রকাশ পেয়ে যায়। তিনি চট্টগ্রাম শহরে লেখাপড়া সমাপ্ত করে গ্রামে গিয়ে নিজ বুযুর্গ মাতা হতে এজাজত চান কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অথবা দেওবন্দ গিয়ে আরও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করার জন্য।

কিন্তু তাঁর বুযুর্গ মাতা ও পার্শ্ববর্তী মির্জাখীল গ্রামের তাঁর ওস্তাদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আবদুল হাই (র)-এর নির্দেশে কলকাতা দেওবন্দ না গিয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাড়ির নিকটে বিখ্যাত গারাংগিয়া মাদ্‌রাসার সূচনা করেন।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে হযরত আজমগড়ী (র)-এর চট্টগ্রাম সফরকালে তিনি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তরীকতে দাখিল হন। এতে করে তাঁর পীর সাহেব চট্টগ্রামে তাশরিফ আনলে তিনি তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং বারে বারে আজমগড় গমন করতেন। অর্থাৎ মাদ্‌রাসার খেদমতের পাশাপাশি তিনি তরীকতের কাজ চালিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের অতি উচ্চাঙ্গে পৌঁছে যান। এতে করে তাঁর হযরত পীর সাহেব তাঁকে খেলাফত দানে ভূষিত করেন।

তাঁর জীবনে শরীয়ত ও তরীকতের খেদমতের ব্যাপকতা ও বিশালত্ব এখানে ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি অত্র গ্রন্থকার রচিত ৪৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপী তাঁর জীবনীগ্রন্থের ওপর আলোকপাত করলে হয়ত কিছুটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

গারাংগিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা বাদেও তাঁরই যোগ্য নেতৃত্বে ও মুরুব্বিয়ানায় দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল স্তরে ৬১ টি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর রয়েছে শত শত মসজিদ, মক্তব, খানকাহ, হেফজখানা, এতিমখানা, সাধারণ শিক্ষালয়সহ নানান ধর্মীয় শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বহু কারামত রয়েছে। এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ৭ জিলক্বদ ১৩৯৭ হিজরী, ২১ অক্টোবর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে, ৪ কার্তিক ১৩৮৪ বাংলা শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল করেন। লক্ষাধিক লোকের সমাগমে ঐদিন আসরের সময়ে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী অতি স্নেহের ছোট ভাই ও পীর ভাই হযরত ছোট হুযূর (র)-এর ইমামতিতে নামাযে জানাযার পর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত গারাংগিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা জামে মসজিদ সংলগ্নে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

আমি অত্র গ্রন্থকার তার নগণ্য মুরীদ হই।

গারাংগিয়া হযরত বড় হুযূর (র)-এর কটি নসীহত

হযরত পীর সাহেব কেবলার আজমগড়ী (র) মূল্যবান উপদেশগুলো সর্বোতভাবে সমর্থন করে তা কার্যকর করা প্রত্যেক তরীকতপন্থীদের একান্ত কর্তব্য।

স্মরণ রাখা উচিত যে, সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন যথাযথ পালন করতে হবে। ইখলাসবিহীন কোনো আমল ও ইবাদত কবুল হয় না।

শরীয়তের তিন অংশঃ ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস। তরীকত, শরীয়তের খাদেম। পূর্ণ ইখলাসের মাধ্যমে 'রেযায়ে মাওলা' (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি) অর্জিত হয়। তরীকতের উদ্দেশ্য শরীয়তের পরিপূর্ণতা লাভ করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ছুফিয়ায়ে কিরামগণ বিভিন্ন সময় যে সমস্ত হালত উপলব্ধি করে থাকেন, তা নিছক কল্পনামাত্র। তরীকত কিশোরদের মন ভুলানো ব্যাপার নয়। এসব অতিক্রম করে 'মকামে রেযা'য় পৌঁছতে হবে। সংকীর্ণমনা লোকেরা উহা আসল উদ্দেশ্য মনে করে থাকে। এটা অত্যন্ত ভুল, এর দ্বারা শরীয়তের পূর্ণতা লাভ হতে মাহরুম থেকে যায়। এটা হযরত ইমামে রব্বানীর (র) ৩৬ নম্বর অনুলিপির অংশ বিশেষ।

খোদাপ্রেমিকদের উচিত, প্রথমে দীনি ইলম অর্জন করা। তা বই-পুস্তক বা উলামায়ে কিরামদের সাহচর্যে হোক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বিদা অনুযায়ী আমল দুরস্ত করতে হবে। স্বীয় মুর্শিদের শিক্ষা-দীক্ষা ও নির্দেশ মোতাবেক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে তরীকতের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করবে।

দুশ্চরিত্র ও কুস্বভাবসমূহ হতে পরহেয করতে হবে। যেমন, লোভ-লালসা, অবৈধ কামনা, ক্রোধ, মিথ্যাচার, অপবাদ দেয়া, কার্পণ্য, হিংসা, লোকদেখানো ভাল কাজ, অহংকার, শত্রুতা, অহমিকা, আত্মাভিমান, কটু ব্যবহার, বিমর্ষতা, হৃদয়ের কঠোরতা, কটুক্তি ও আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি। সচ্চরিত্র ও আদর্শবান হতে হবে। যেমন, সহনশীলতা, সহৃদয়তা, হাস্যময়তা, সাধ্যানুগ আতিথেয়তা, গরীবের প্রতি সদয় মনোভাব, বিপদে ধৈর্যধারণ, নিয়ামত প্রাচুর্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, দারিদ্র্যে তুষ্টি, খোদা নির্ভরতা, সুখ-দুঃখে সন্তোষ ও সমর্পণী মনোভাব, বিনয় ও নম্রতা অর্জন ইত্যাদি।

ইত্তেবায়ে সুন্নতের অনুসারী হতে হবে। এটা রূহানী উন্নতির সোপান।

যিক্‌রে ইলাহী হতে কখনও গাফেল হতে নেই। এটা বড় নিয়ামত। এর দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তায়ালা যে 'যিক্‌রে কসীর' (অধিক যিক্‌রের) ইরশাদ করেছেন, তার মানে খোদা-বিমুখ না হওয়া। তাই পাচ-আনপাচ, যিক্‌রে-খফি এবং উকুফে-ক্বলবী সর্বদা চালু রাখবে।

নামায জামাতের সাথে একাগ্রচিত্তে যথাসময়ে আদায় করবে।

কদাচিৎ গুনাহ্ হলেতা শীঘ্রই তওবা করে নেক আমলে পরিণত করতে হবে।

প্রত্যহ কুরআন মজিদ তেলওয়াতের অভ্যাস রাখবে। যদি সম্ভব হয় তাহিয়্যাতুল অযূ'র নামায, এশরাক, চাশ্‌ত, আওয়াবিন, তাহাজ্জুদ ও সালাতুত্ তসবিহ'র অভ্যাস রাখবে। এ সব কিছু দ্বারা তরক্কী ও উন্নতির রাস্তা খুলে যায়। সওয়াবও অধিক পাওয়া যায়।

আমাদের পীর সাহেব কেব্‌লা'র ইরশাদ যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ছয় ঘন্টা মোরাকাবা করা প্রয়োজন। জীবনের সমস্যাদির কারণে কেউ যদি এতক্ষণ মোরাকাবা না করতে পারে তাহলে অন্তত চার ঘন্টা দরকার। চার ঘন্টার চেয়ে যাতে কম না হয়।

কাশফ ও কারামতের খেয়াল না হতে হবে। তদ্বারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে গায়রে খোদার তালেব বনে যাওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু দেখা ফযীলত ও বেলায়তের মাপকাঠি নয়। বাতেনী মা'লুমাত মনোমুগ্ধকর বিষয়। কিন্তু এর ওপর এতমিনান না হওয়া দরকার। ধর্মীয় মঙ্গল ও প্রয়োজন ব্যতিরেকে ধনী ও দুনিয়া প্রত্যাশীদের সংস্রব ত্যাগ করা চাই।

ছেলে-মেয়েদের ও শরীয়ত বিরোধী ফকির ইত্যাদির ছোহবত থেকে বেঁচে থাকবে।

ওলী উনিই হন যার মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহ্‌র ভয় থাকে।

খাওয়া দাওয়ার মধ্যে এ'তেদাল অর্থাৎ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। হালাল খানা, হালাল কামাই, সত্য কথা বলা ওয়াজিব।

অভাব ও অনটনে মনক্ষুণ্ন হবে না।

নিজকে নিজে অতি ছোট জানবে।

বাতেনী অবস্থা আপন শেখ ব্যতিত কারো সামনে প্রকাশ করবে না।

কারো দোষ ত্রুটি তালাশ করবে না। সবসময় নিজের দোষের দিকে লক্ষ্য রাখবে।

গরিব, মিসকিন, ওলামা, ছোলাহাদের ছোহবতকে গনীমত মনে করবে। বিশেষভাবে আপন পীর সাহেবের ছোহবত, মোহাব্বত ও খেদমতকে সবচেয়ে উত্তম মনে করবে। ওনার চাল-চলন ও কথাবার্তা অনুসরণ করবে।

নিরবতা ও নির্জনতা অবলম্বন করবে।

আল্লাহ্‌র মোহাব্বত ও রাসূলের মোহাব্বতকে আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের মোহাব্বতের ওপর গালেব রাখবে। বরং গায়বের মোহাব্বত থেকে অন্তরকে একদম পবিত্র রাখার চেষ্টা করবে।

সময়ের কদর করবে। প্রতিদিন নিজের আমলের হিসাব নিবে।

কম হাসবে, বহুত ক্রন্দন করবে। আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় করতে থাকবে। প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যুকে স্মরণ করবে।

একমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে শত্রুতা ও মিত্রতা পোষণ করবে।

যতটুকু সম্ভব হয় সৃষ্টির ফায়দা পৌঁছাতে থাকবে।

নিজ পীর ভাইদের সাথে হামদরদী ও মোহাব্বতের সহিত থাকবে। পরস্পর যদি কোনো মতবিরোধ হয় তা নীরব ও হৃদ্যতাপূর্ণ কথা দ্বারা মীমাংসা করবে।

বান্দার হক থেকে দায়িত্বমুক্ত হওয়া ওয়াজিব, যেভাবে হউকনা কেন।

প্রত্যেক নামাযের পর ইস্তিগফার করা জরুরী। বিশেষ করে শেষরাতে তা অত্যন্ত উপকারি।

লেনদেনকে ইবাদত আর দুনিয়াদারীকে দীনদারীতে পরিণত করবে। এভাবে যেমন ঃ পানাহার করা, ঘুমানো, জাগ্রত হওয়া, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সব আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিয়ত করবে। সওয়াবের নির্ভরশীলতা নিয়তের ওপর।

মানুষের সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র মাধ্যম হলো নফ্‌স। যদি তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন তাহলে অন্তরের বন্ধু, অন্যথায় পরম শত্রু। এ রেয়াযত ও মেহনতের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া একান্ত কর্তব্য। যদি চেষ্টায় সফল হয়েছেন তাহলে বুঝবেন যে, দরজায়ে আম্মারাহ থেকে দরজায়ে মুত্মায়িন্নাতে পৌঁছে গেছেন।

হযরত শেখ কোরবান আলী (র)

হাওড়া, কলকাতা, ভারত

হযরত শেখ কোরবান আলী (র) কলকাতা নগরীতে চিরনিদ্রায় শায়িত। হুগলিতে দ্বিতীয় সেতু তথা বিদ্যাসাগর সেতু হাওড়া প্রান্তে সেতুর নিচে এক পার্শ্বে তাঁর মাযার রয়েছে সাথে একটি মসজিদও। ১৩৬ আন্দুল রোড বলে, গেসকিন উইলিয়ামের নিকটে।

হযরত শেখ কুরবান আলী কোন দেশের লোক ছিলেন এবং তাঁর মোবারক জীবনের দিক নিয়ে জানার আগ্রহ থাকার পরও জানতে পারিনি।

হযরত সাইয়েদ ওয়াজেদ আলী (র)

কলকাতা, ভারত

হযরত সূফী সাইয়েদ ওয়াজেদ আলী (র) হযরত ওয়াইসী (র)-এর কয়েকজন বিখ্যাত খলীফার মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়

এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত সাইয়েদ মাওলানা বশরত আলী (র)। দিল্লীর সম্রাট তাঁদের পূর্বপুরুষকে ১২ হাজার বিঘা জমি সম্মানী প্রদান করেন। ঢাকার মীরপুরস্থ হযরত সূফী শাহ আলী বোগদাদী (র) হযরত সাইয়েদ ওয়াজেদ আলী (র)-এর উর্ধ্বতন পুরুষ। হযরত সাইয়েদ বশরত আলী ঢাকার নবাব পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কলকাতা শহরে ঢাকা নবাব পরিবার সাইয়েদ বশরত আলীর সম্মানার্থে একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেন।

তথায় হযরত সাইয়েদ ওয়াজেদ আলী (র) হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাক্ষাৎ লাভ করে তরীকতে দাখিল হন।

তিনি কঠোর সাধনার বলে আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ আসনে পৌঁছে যান। এতে করে হযরত ওয়াইসী (র) তাঁকে খেলাফত দানে ভূষিত করেন। শরীয়তের পাশাপাশি তরীকত জগতে তাঁর বিরাট খেদমত রয়েছে। এ মহান ওলী ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। কলকাতা নগরীর পার্ক সার্কাস চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের নিকটে গোবরা (১) কবরস্থানের উত্তর পার্শ্বে রাস্তার উত্তর সংলগ্ন তাঁর কবর রয়েছে। তাঁর খলীফাগণের মধ্যে হযরত সূফী ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (র), হযরত সূফী আবদুর রহীম-দিনাজপুর, মাওলানা আহমদ আলী মুজাদ্দেদী-শাহাজাদপুর (বৃহত্তর পাবনা), সূফী জমসেদ আলী-বগুড়া অন্যতম।

হযরত সূফী এনায়েতপুরী (র)-এর বেশ কজন বিখ্যাত স্বনামধন্য খলীফা রয়েছেন। তন্মধ্যে ফরিদপুরের আটরশি বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের হযরত সূফী হাসমত উল্লাহ্ (র), চন্দ্রপাড়া হযরত সূফী সুলতান আহমদ (র) অন্যতম। ঢাকা আরামবাগের দেওয়ানবাগী চন্দ্রপাড়া হযরত সুলতান আহমদ (র)-এর জামাতা ও খলীফা।

হযরত মৌলভী আতায়ে এলাহী (র)

মঙ্গলকোট, বর্ধমান, ভারত

হযরত মৌলভী আতায়ে এলাহী (র) মঙ্গলকোটে নিজ বাড়ির নিকটে কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত। হযরত হামিদ বাঙালীর মাযারের মাত্র ২/৩ শত মিটার উত্তরে এই কবরস্থান। তাঁর এক পুত্র এক কন্যা ছিলেন। পুত্র কাজী আবদুল্লাহ্ হক এর দুই পুত্র কাজী আতাউল হক ও কাজী নজমুল হক। কাজী নজমুল হকের তিন পুত্রের মধ্যে ৫০ ও ৪০ বছরের দু'পুত্র তাদের অগ্রজ ও এই মহান ওলীর মোবারক জীবনের ওপর কোন তথ্য দিতে পারল না।

কলকাতা নগরী ও তথায় যিয়ারত

প্রায় ৩১০ বছর পূর্বে কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমাদের এই উপমহাদেশে সাগরপথে এসে হুগলী নদীপথে কলকাতা পৌঁছে। আগে বলা হতো কলিকাতা। বর্তমানে নাম পরিবর্তন করে কলকাতা করা হয়েছে। পূর্ব নাম Calcutta এবং বর্তমান নাম Kolkata অর্থাৎ পূর্বে ক্যালকাটা এবং বর্তমান কলকাতা।

১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে কলকাতা নগরীর কথা প্রকাশ পেতে থাকে। ১৬০০ শতকের শেষ ভাগে আবুল ফজলের লেখা আইন-ই-আকবরী গ্রন্থেও কলকাতার কথা উল্লেখ করা আছে। এতে হয়ত ধারণা করা যেতে পারে যে ৩০০ বছরের আগেই কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে।

তবে মূলত ঃ ব্রিটিশরাই কলকাতাকে নগর হিসেবে সৃষ্টি করে হুগলী নদীর তীরে। উদ্দেশ্য ঘাঁটি করা। ১৬৯৯-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে ব্রিটিশরা। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ দিল্লীর মোঘল বাদশা ফারুক-এর ফরমানে ব্রিটিশ কোম্পানী কলকাতায় আরও শক্ত অবস্থান নিতে সুযোগ পায়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত ও হত্যা করে ব্রিটিশের পক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লর্ড ক্লাইভ কলকাতার ভিত আরও মজবুত করতে সক্ষম হন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্বীকৃতি পেয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতাতে স্থানান্তর করেন প্রথম গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস। এতে করে কলকাতা নগরী দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। নানা অবকাঠামো, বাড়িঘর গড়ে উঠতে শুরু করে। বর্তমানে কলকাতা ভারতবর্ষে জনসংখ্যার দিক দিয়ে প্রথম নগরী। এককালে কলকাতা নগরীর বাসিন্দার মধ্যে শতকরা ৫০ জন ব্রিটিশ নাগরিক ছিল।

কলকাতা নগরীতে প্রথম রেল চালু হয় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ ১৫ আগস্ট হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত। উপমহাদেশে একমাত্র পাতাল রেল আছে কলকাতা নগরীতে।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ ব্রিটিশরা বিখ্যাত হাওড়া ব্রিজ নির্মাণ করে। ভারতে প্রথম প্ল্যানেটোরিয়াম চালু হয় এস-পি বিড়লার বদান্যতায় কলকাতায় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মোঘল সম্রাটদের লালকিল্লার মধ্যে ভাতার বিনিময়ে রেখে মসনদ চালায় ব্রিটিশরা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবের পর ব্রিটিশরা দিল্লীতে বসে এককভাবে মসনদ চালায়। কিন্তু ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম জর্জ ঘোষণা দিয়ে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে নিয়ে যান এবং নতুন দিল্লী নামকরণে নব সাজে সাজাতে তৎপর হন ২৬ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী বিশাল এরিয়া নিয়ে।

কলকাতা থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হলেও অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতাই থেকে যায়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করে পূর্ব বাংলা ও আসামের রাজধানী ঢাকায় করা হয়েছিল সাময়িকভাবে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একনাগাড়ে কলকাতা অবিভক্ত বাংলার রাজধানী ছিল।

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কলকাতা বলতে বিনোদন বুঝে। যেহেতু কলকাতাতে বিনোদনের নানান কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এবং ঐ সংলগ্ন সন্ধ্যায় Lights and Sounds, বিড়লা প্লেনেটোরিয়াম, বিখ্যাত আলিপুর চিড়িয়াখানা, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, জহর শিশু ভবন, রেসকোর্স, মার্বেল প্যালেস, রাজভবন, মিলেনিয়াম পার্ক, হেরিটেজ পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সম্প্রতি চালু হওয়া Science City অন্যতম। তার উপর বিত্তবানদের চোখ-ঝলসানো বিলাসবহুল বিশাল দোকানাদি রয়েছে কলকাতার বিভিন্নস্থানে। তার উপর হিন্দু সম্প্রদায়ের নানান মন্দির ও খ্রিস্টানদের নানান গির্জাতো রয়েছেই।

কিন্তু কলকাতা নগরীতে ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন মুলসমানদের জন্য ধর্মীয় খোরাক রয়েছে। কলকাতার পুরাতন শহর জাকারিয়া স্ট্রীট-এ নাখোদা মসজিদ বাদে সেকালের বিখ্যাত মসজিদ নাই বললেই চলে। কিন্তু এই কলকাতা নগরীতে আল্লাহ্‌পাকের বহু মহান ওলী ও শহীদ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এতে করে বাংলাদেশ থেকে সংখ্যায় কম হলেও শুধুমাত্র কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভারত গমন করে থাকেন। তন্মধ্যে কয়েকজন মহান আল্লাহর ওলী ও শহীদের কথা এখানে উল্লেখ করলাম।

১. দুই মহান যুবক শহীদ

কলকাতা নগরীতে চিরনিদ্রায় পাশাপাশি শায়িত আছেন দুই মহান যুবক শহীদ। কলকাতা নগরীর চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের নিকটে পার্ক সার্কাস গোবরা

(১) কবরস্থানে এই মহান দুই শহীদ পাশাপাশি শায়িত রয়েছে। ব্রিটিশের দোর্দণ্ড প্রতাপের সময় ১৯২০ এর দশকে কলকাতা নগরী থেকে মানব নামের এক কলঙ্ক "রঙ্গিলা রসূল" নামে এক বই লিখে তা প্রকাশ করে। নবীজী (সা)-এর পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপনই ছিল তার লেখার উদ্দেশ্য। এই বই প্রকাশের সাথে সাথে ভারতবর্ষের নবীপ্রেমিকগণের মনে দারুণ আঘাত লাগে।

আঘাত লাগে অবিভক্ত পাঞ্জাবের দুই নবীন যুবকের। তাদের একজনের নাম আমীর আহমদ, বয়স মাত্র ২১। এবং অপরজনের নাম আবদুল্লাহ্ খান, বয়স মাত্র ১৯। উভয়েই এক মায়ের সন্তান এবং লাহোরের অধিবাসী মতান্তরে আমীর আহমদ অমৃতসরের এবং আবদুল্লাহ্ খান লাহোরের ও দু'মায়ের সন্তান।

স্বাধীনচেতা নবীপ্রেমিক এই নবীন যুবকদ্বয় কলকাতা থেকে প্রকাশিত "রঙ্গিলা রসূল" নামের বইয়ের কথা জানতে পেরে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে রেলযোগে চলে আসে কলকাতায় এবং নগরীর কোন এক স্থানে অবস্থান নেয়। খুঁজে বের করে ঐ কুখ্যাত লেখক-প্রকাশককে।

প্রকাশ্যে তাকে হত্যা করে। কিন্তু না, "রঙ্গিলা রসূলের" লেখক প্রকাশককে হত্যা করে জীবন রক্ষার জন্য তারা পালিয়ে যায়নি। বরং জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে সংবাদ পাওয়া মাত্র পুলিশ এসে তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

গ্রেফতারকালে যুবকদ্বয় বারে বারে বলতে থাকে তারা সুস্থ মস্তিষ্কে নবীজীর (সা)-এর জঘন্য দুশমনকে হত্যা করতে পেরে গর্বিত। তারা এই জন্যে এই কাজ করেছে যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ নবীজী (সা)-এর বিরুদ্ধে কলম ধরতে ভয় পায়।

তখনকার আমলে বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও স্বনামধন্য আইনজীবী শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকসহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী জেলে গিয়ে যুবকদ্বয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে কথা বলেন, যাতে তারা ছাড়া পেতে পারে বা সাজা কঠিন না হয়ে লঘু হয়। কিন্তু না, নবীপ্রেমিক নবীন যুবকদ্বয় অবিচল অটল। জেলে আবদ্ধ থাকার পরও জীবনের প্রতি তাদের ন্যূন্যতম তোয়াক্কা নেই। বারে বারে বলতে থাকে সুস্থ মস্তিষ্কে খুশি মনেই তারা এ কাজ সম্পন্ন করেছে। অতএব মিথ্যা তো নয়ই বরং রাগের মাথায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্যভাবে হত্যা করেছে এ কথা বলারও তাদের কোন ইচ্ছা নেই এবং শেষ পর্যন্ত আদালতে বারে বারে তাই সত্য কথাই বলে গেছে। অতএব আদালতের রায়ে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ গভীর রাতে এই যুবকদ্বয়ের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

ব্রিটিশের দোর্দণ্ড প্রতাপের মধ্যেও কতেক নবীপ্রেমিক ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে এই মহান যুবক শহীদদ্বয়কে সসম্মানে পাশাপাশি দাফন করেন।

আজও কলকাতা নগরীর পার্ক সার্কাস চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের নিকটে গোবরা (১) বিশাল কবরস্থানের মধ্যে এই মহান দুই যুবক শহীদের কবর শরীফ প্রতিদিন নবী প্রেমিকগণ যিয়ারত করে চলেছেন।

২. হযরত সূফী সাইয়েদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (র)

অত্র গ্রন্থে বারে বারে উল্লেখ করা আছে এই মহান আল্লাহর ওলী ও আশেকে রাসূল (সা) কলকাতা নগরীর প্রসিদ্ধ মানিকতলা, লালাবাগান, মুন্সিপাড়া লেইন-এ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

৩. হযরত সাইয়েদ ওয়াজেদ আলী (র)

হযরত সাইয়েদ ওয়াজেদ আলী (র) হযরত ওয়াইসী (র)-এর অন্যতম খলীফা হন। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অত্র গ্রন্থে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তিনি কলকাতা নগরীর পার্ক সার্কাস চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের নিকটে গোবরা (১) বিশাল কবরস্থানের উত্তর পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

৪. হযরত আজানগাছী (র)

হযরত মাওলানা আজানগাছী (র) হুগলী জেলার আজানগাছী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম অনেকটা লোপ পেয়ে যায়। তবে তাঁর মূল নাম হযরত মাওলানা আবদুল ওদুদ (র) বলে কোন কোন লেখক বলে থাকেন। ফার্সি ভাষায় তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। মহান আল্লাহর দেওয়া ইলম "ইল্‌মে লাদুন্নি'র অধিকারী ছিলেন বলে জানতে পারা যায়। তিনি নিজ জন্মভূমি থেকে হিজরত করে কলকাতা নগরীর মানিকতলায় ৪০/৫০ বছর পর্যন্ত অবস্থান করেন। একখানা কাপড় গলা পর্যন্ত ঢেকে রাখতেন। কারও নিকট হতে কোন হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করতেন না। প্রত্যেক শুক্রবার জুম'আর নামাযের পর লোকদের স্বপ্নের তা'বীর করতেন। প্রতি রবিবার কুরআন পাকের তাফসীর পেশ করতেন। কুরআন পাকের কতেক সূরা ও দরূদ শরীফ পাঠ করে সমস্ত বুযুর্গানে দীনের রুহের সওয়াব রেছানি করতেন। পরবর্তীতে এর নামকরণ হয় উরসেকুল (অর্থাৎ প্রত্যেকের রুহের প্রতি সওয়াব রেছানি)। যারা তাঁর খেদমতে যেতেন তাদেরকে উরসেকুলের তালীম দিতেন।

তিনি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী (র)-এর মুরীদ এবং খলীফা ছিলেন বলে জানতে পারা যায়। গুরুত্বপূর্ণ কোন কথার মধ্যে হযরত হাজী সাহেবের (র) জুতার বরকতে পেয়েছেন বলে তিনি বলতেন। তিনি কলকাতা নগরীর মানিকতলায় চিরনিদ্রায় শায়িত।

৫. হযরত মাওলানা ছফীউল্লাহ্ (র)

হযরত মাওলানা ছফীউল্লাহ (র)-একজন বিখ্যাত আলেমে দীন ও পীরে কামেল ছিলেন। তিনি কলকাতা নগরীর মানিকতলায় চিরনিদ্রায় শায়িত। তাঁর জীবনের উপর বিস্তৃত জানা যায় না।

৬. হযরত আফজল কলন্দর (র)

হযরত আফজল কলন্দর (র) একজন বড় মাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ ১৩১৯ হিজরী ইন্তিকাল করেন। কলকাতার বিখ্যাত গোবরা কবরস্থানে তিনি শায়িত।

৭. হযরত মাওলানা আবদুল আউয়াল (র)

হযরত মাওলানা আবদুল আউয়াল (র) হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (র)-এর ছোট সন্তান। তিনি বিখ্যাত আলেমে দীন ছিলেন। বিশেষ করে আরবী, ফার্সি, উর্দুর পাশাপাশি তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রেও বিখ্যাত ছিলেন। আরবী, ফার্সি, উর্দু ভাষায় তাঁর অনেক কবিতা রয়েছে। তিনি একাধিক মূল্যবান কিতাব লিখেছেন। তিনি তাঁর পিতা ও বড় ভাইয়ের ন্যায় ইসলাম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কলকাতার মানিকতলায় তাঁর মাযার অবস্থিত।

৮. হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (র)

হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (র) কলকাতার চুনাগলির এক মসজিদের ইমাম ছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত ওলী হযরত মাওলানা ছফীউল্লাহ্ (র)-এর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন তিনি। খুবই গরীবি অবস্থায় থাকতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। তিনি প্রত্যহ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বার পর্যন্ত ইসমে জাতের যিকির করতেন। তাঁর ইন্তিকালের সন তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর মাযার কলকাতার চুনাগলিতে রয়েছে বলে জানতে পারা যায়।

৯. হযরত সাইয়েদ মুর্শিদ আলী শাহ (র)

হযরত সাইয়েদ আলী আবদুল কাদের প্রকাশ মুর্শিদ আলী শাহ (র) ১৬ জুলাই ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ, ২৭ রমযান ১২৬৭ হিজরী জুম'আর রাতের শেষভাগে

মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত সাইয়েদ মেহের আলী শাহ্ (র)-এর পুত্র। তিনি মাদরজাত ওলী ছিলেন অর্থাৎ মাতৃগর্ভে তিনি বেলায়েত প্রাপ্ত হন। তার উপরে তিনি ইলমে লাদুন্নির অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল প্রখর এবং জ্ঞান ছিল অগাধ।

তিনি জীবনের বড় অংশ কলকাতা নগরীতে কাটান। তাঁর বহু কারামত রয়েছে। তিনি ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ মেদিনীপুরে ইন্তিকাল করেন। কলকাতাতে তাঁর খানকাহ্ রয়েছে।

১০. হযরত আবদুল গনী (র)

হযরত আবদুল গনী (র) একজন উঁচুমাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি ৮৭৯ হিজরী ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ ইন্তিকাল করেন। কলকাতায় তাঁর মাযার অবস্থিত বলে জানতে পারা যায়।

১১. হযরত মাওলানা ইলাহ্‌দাদ (র)

হযরত মাওলানা ইলাহ্‌দাদ (র) মুঙ্গের জেলার মোজাফফরাবাদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২৪১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক হন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ তিনি হজ্জে গমন করেন। তিনি বিখ্যাত আলেমে দীন ছিলেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ, ১৩২০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। কলকাতা নগরীতে তাঁর কবর শরীফ রয়েছে বলে জানতে পারা যায়।

১২. হযরত খাকী শাহ্ লাহোরী (র)

হযরত খাকী শাহ্ লাহোরী (র) একজন বিখ্যাত আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি কলকাতায় বসবাস করতেন। ১৩১৩ হিজরী, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। কলকাতা নগরীতে তাঁর কবর শরীফ বলে ধারণা করা হয়।

১৩. হযরত মাওলানা খায়রুদ্দীন কাসুরী (র)

হযরত মাওলানা খায়রুদ্দীন কাসুরী (র) একজন উঁচুমাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি কঠোর শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন। তাঁর লিখিত একাধিক কিতাব দেশে সাড়া জাগায়। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আবুল কালাম একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত কাসুরী (র) ১৩৩৬ হিজরী, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। কলকাতা নগরীর মানিকতলার নাখোদা কবরস্থানে তিনি শায়িত।

১৪. হযরত মাওলানা আহমদ আলী হামিদ জালালী (র)

হযরত সূফী আহমদ আলী হামিদ জালালী (র) ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বেলেঘাটার কলাবাগানে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সূফী মুন্সি মোহাম্মদ হানিফ (র)। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের কথা জানতে পারা যায়। ছোটকাল থেকেই তাঁর বুযুর্গীর প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি ফুরফুরার বিখ্যাত ফাতেহিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান ছিলেন ১৬ বছর ধরে। বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণ তাঁকে সম্মান করতেন। বিশেষ করে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক তাঁকে সমীহ করতেন। তিনি ফুরফুরার হযরত আবু বক্‌র সিদ্দিকী (র)-এর অন্যতম খলীফা ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পশ্চিম বাংলায় বহু ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তিনি বাংলা, উর্দু ও আরবী ভাষায় ৮টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মানিকতলা হযরত ওয়াইসী (র)-এর মাযারের যাবতীয় কিছু তদারক করতেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী, বুধবার কলকাতাস্থ তাঁর জামাতা আখতারী সাহেবের বাড়িতে তিনি ইন্তিকাল করেন। কলকাতা গার্ডেন বীচের অন্তর্গত কানোহালীর পীরডাঙ্গায় তাঁর মাযার শরীফ রয়েছে। তাঁর জামাতা ও খলীফা হযরত মাওলানা জয়নাল আবেদীন আখতার (র) ও তাঁর নিকটে চিরনিদ্রায় শায়িত।

১৫. হযরত দিদার বখ্‌শ (র)

অত্র গ্রন্থের 'কজন খলীফার সংক্ষিপ্ত পরিচয়' অধ্যায়ে হযরত দিদার বখ্‌শ (র) সম্পর্কে খানিকটা জানা যাবে।

১৬. হযরত শেখ কোরবান আলী (র)

হযরত শেখ কোরবান আলী (র) সম্পর্কেও অত্র গ্রন্থের 'কজন খলীফার সংক্ষিপ্ত পরিচয়' অধ্যায়ে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।

উপরোক্ত মহান আল্লাহর ওলীগণের পর কলকাতা নগরীতে প্রায় আট-দশটি বিশাল বিশাল কবরস্থান রয়েছে। তথায়ও বহু মহান ওলী শায়িত আছেন। সাথে সাথে কলকাতা নগরীর নানা স্থানে আল্লাহ্ পাকের আরো অনেক ওলী শায়িত রয়েছেন।

কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার সাথে সম্পৃক্ততা

কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাথে নানা দিক দিয়ে সম্পৃক্ত। গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে, হযরত ওয়াইসী (র) কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার সাময়িক শিক্ষক ছিলেন। অপরদিকে হযরত ওয়াইসী (র)-এর খলীফা ও মুরীদগণের মধ্যে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা গর্ব করতে পারে সেইরূপ ছাত্র ও শিক্ষকও রয়েছেন। তদুপরি হযরত ওয়াইসী (র) জীবনের বড় অংশ কাটিয়েছেন কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার নিকটস্থ বিবি সালেট মসজিদ সংলগ্ন ঘরে।

ব্রিটিশরা উপমহাদেশের উপনিবেশ শাসন জারি রাখলেও তারা এ দেশীয় বাসিন্দাদের মন জয় করতে পারেনি। তারা এ উপমহাদেশীয় জনগণ থেকে মনের দিক দিয়ে দূরে সরে পড়ে। এতে করে ব্রিটিশরা এই দেশীয় জনগণের শোষক না হয়ে সেবক হিসেবে ভূমিকার অবদান দেখাতে তৎপর হয়। ফলে ব্রিটিশরা অন্যান্য সেবামূলক কাজের পাশাপাশি মুসলমানগণের ধর্মীয় শিক্ষায় অবদান রাখতে এগিয়ে আসে।

এতে করে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে উপমহাদেশের বিখ্যাত আল্লামা হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর অন্যতম ছাত্র হযরত মাওলানা মোল্লা সজদিনের (যিনি মৌলভী মদন নামে বিখ্যাত) দ্বারা শিয়ালদহের নিকটবর্তী বৈঠকখানায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রথম মাদরাসা আরম্ভ করেন। তিনি এই মাদ্‌রাসা আলিয়ার সর্বপ্রথম হেড মাওলানা ছিলেন। তখন থেকে সরকারিভাবে তথা স্বয়ং রাজ্যপাল বা গভর্নর মাদরাসার খরচ বহন করতে লাগলেন। কিছুদিনের ব্যবধানে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস মাদ্‌রাসা শিক্ষার ঐ বৈঠকখানার নিকটবর্তী পদ্মপুকুর বস্তিতে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে জমি খরিদ করেন। ঐ এলাকায় একটি গীর্জা ছিল। সেই স্থানটি মাদ্‌রাসা শিক্ষার পরিবেশের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তদানিন্তন মাদ্‌রাসা কমিটি সরকারের নিকট স্থান পরিবর্তনের জন্য আবেদন করে। অতঃপর ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে ব্রিটিশ গভর্নর মাদ্‌রাসা কমিটির আবেদন মঞ্জুর করে ওয়েলেসলি স্কোয়ার নামক স্থানে জমি খরিদ করে দ্রুত মাদ্‌রাসার উদ্দেশ্যে বিরাট দালান

নির্মাণ শুরু করে দেয়। ঐ সময়ে ব্রিটিশ সরকার মাদ্‌রাসা আলিয়ার জন্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করে। ঐ বিশাল অট্টালিকা আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং ঐ বিশাল দালানের নিকটবর্তী রাস্তার অপর পাড়ে কয়েকতলা বিশিষ্ট বিশাল ছাত্রাবাস রয়েছে। মাদ্‌রাসা আলিয়ার দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহদাকারের পুকুর বা দিঘী মাদ্‌রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যবহারের পাশাপাশি তখন নিশ্চয়ই তা মাদ্‌রাসা আলিয়ার শোভা বর্ধনেও সহায়তা করত।

ব্রিটিশ কর্তৃক কলকাতা মাদ্‌রাসা আলিয়া প্রতিষ্ঠিত হলেও উপমহাদেশের বাঘা বাঘা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বগণ এই মাদ্‌রাসা আলিয়ার হাল ধরতে এগিয়ে আসেন।

মাদ্‌রাসা আলিয়া কম্পাউন্ডের পশ্চিম পার্শ্বে কলিন স্ট্রীট। ঐ স্ট্রীট বা রাস্তায় জমিদার মুন্সি গোলাম রহমান মসজিদের পার্শ্বস্থ কক্ষে হযরত ওয়াইসী (র)-এর স্বনামধন্য পীর হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র) বালাকোটের যুদ্ধের আগে ও পরে দীর্ঘদিন অবস্থান করে শরীয়ত ও তরীকতের খেদমত করেছিলেন। মাদ্‌রাসা আলিয়ার পূর্বপার্শ্বে ওয়ালিউল্লাহ্ লেইন। ঐ লেইনে বিবি সালেট মসজিদ অবস্থিত। ঐ মসজিদ সংলগ্ন ঘরে হযরত ওয়াইসী (র) সপরিবারে জীবনের বড় অংশ ব্যয় করে শরীয়ত, তরীকত, মারিফত ও হাকিকতের খেদমতের পাশাপাশি ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা ও হেকিমী চিকিৎসার মাধ্যমে মানব কল্যাণে অবদান রেখেছেন। এতে করে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে হযরত ওয়াইসী (র) ও তাঁর পীর হযরত সূফী নিজামপুরী (র) মাদ্‌রাসার আলিয়ার উভয় পাশে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে তখনকার আমলে মাদ্‌রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের উপর এই মহান দুই ওলীর নেকনজর পড়া স্বাভাবিক। ফলশ্রুতিতে ঐ মাদ্‌রাসা থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত আলেম ওলামাগণের পাশাপাশি আল্লাহপাকের বহু মহান ওলী বের হয়েছেন।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গসহ কলকাতা থেকে দলে দলে মুসলমানগণ বাংলার এই অংশে চলে আসতে থাকে। এতে করে মাদ্‌রাসা পরিচালনাকারীগণসহ প্রায় অনেকেরই ধারণা, বাংলার এই অংশে যখন মুসলমান থাকতেছেন না অতএব কলকাতা মাদ্‌রাসা আলিয়ার প্রয়োজন নেই। এবং এই মনে করে কলকাতা মাদ্‌রাসা আলিয়ার প্রায় সমস্ত কিতাবাদি সাগর ও নদীপথে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়, ঢাকা মাদ্‌রাসা আলিয়ার উদ্দেশ্যে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আরবী বিশ্ববিদ্যালয় তথা কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা বর্তমানে তার জৌলুশ সজীবতা হারিয়ে ফেলেছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ পুনরায় কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা চালু করেন। কিন্তু মাদ্‌রাসা তার ভাবমূর্তি ধরে রাখতে ব্যর্থ। বর্তমানে ঐ মাদ্‌রাসা ঝিমিয়ে চলছে মনে হয়। কলকাতা মাদ্‌রাসা কলেজ যেমনি নামকরণ তেমনি বাহির দৃশ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষা আছে বলে মনে হবে না। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার বছর স্বীকার করলেও এই মাদ্‌রাসা আলিয়ার ছাত্র-শিক্ষক বলতে সবাই পেন্ট-শার্ট পরিহিত। মাদ্‌রাসার দক্ষিণ পার্শ্বের বিশাল পুকুরটি তার বিশুদ্ধ পানির স্বকীয়তা হারিয়ে আবর্জনা মিশ্রিত পানি বলা যেতে পারে।

জানিনা ভারত সরকার উপমহাদেশের এই প্রাচীনতম ও বিখ্যাত আরবী বিশ্ববিদ্যালয় তথা কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে কতটুকু ভূমিকা রাখবে।

চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ

যদিওবা হযরত ওয়াইসী (র) যৌবন-এর প্রারম্ভে বা তারও আগে চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান তথাপি এই অঞ্চলে তরীকতের পাশাপাশি সাধারণ মাদ্‌রাসা শিক্ষার খেদমত দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত ওয়াইসী (র)-এর পীর সাহেবের পীর ভাই হন বালাকোটের গাজী হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (র) (চুনতি, চট্টগ্রাম)। তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা আবদুল হাই ও হযরত মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ্ হযরত ওয়াইসী (র) কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক থাকাকালীন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। হযরত মাওলানা আবদুল হাই হুগলীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত মাওলানা ফজলুল হক (র) চুনতি এবং খান বাহাদুর হাছান সাহেবের মামা মাওলানা আবদুর রশীদ সাহেব একইভাবে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর ছাত্র ছিলেন। বালাকোটের গাজী হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (র) খান সিদ্দিকী-এর সহোদর ভ্রাতা চুনতির ডেপুটি বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা নাছিরুদ্দীন ডেপুটিও কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন। তবে হযরত ওয়াইসী (র)-এর ছাত্র ছিলেন কিনা স্পষ্ট নয়।

যদিও যোগাযোগ প্রতিকূলতার পাশাপাশি নানান ব্যস্ততায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর পক্ষে চট্টগ্রাম সফর করার কথা জানতে পারা যায়নি কিন্তু এই অঞ্চলের সাথে তাঁর যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। চুনতির পাশাপাশি বাংলার পূর্বাংশসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেকের সাথে তাঁর শরীয়ত ও তরীকতের সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ করে চট্টগ্রামে তাঁর দু'জন স্বনামধন্য খলীফা রয়েছেন।

জন্মভূমিতে তাঁর নামকরণে মাদ্‌রাসা

চট্টগ্রাম জেলার বৃহত্তর সাতকানিয়া উপজেলা বর্তমান লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক ছোবহান গ্রামে যে হযরত ওয়াইসী (র) জন্মগ্রহণ করেন তা অত্র গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা আছে এবং এও উল্লেখ করা আছে যে সাতকানিয়া উপজেলার গারাংগিয়া হযরত বড় হুযূর (র) হযরত ওয়াইসী (র)-এর তরীকতের সিলসিলার একজন বিখ্যাত পীরে কামেল। তাঁরই দুই মুরীদের দানকৃত জমিতে মল্লিক ছোবহান গ্রামে হযরত ওয়াইসী (র)-এর নামকরণে একটি মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২০০২ সালে।

এই মাদ্‌রাসার নামকরণ করা হয় "মল্লিক ছোবহান সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) মহিলা মাদ্‌রাসা"। গারাংগিয়া হযরত বড় হুযূর (র)-এর যে দুই মুরীদের দানকৃত জমিতে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তারা হলেন এ গ্রামেরই মোসাম্মৎ শামিলা বেগম এবং আলহাজ্জ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী প্রকাশ আনোয়ার মিয়া। তবে উক্ত গ্রামে আরও কয়েকজন ব্যক্তি মাদ্‌রাসার জন্য কিছু কিছু জমি দান করেন। গারাংগিয়া হযরত বড় হুযূর (র)-এর অতি প্রিয় ছোট ভাই হযরত ছোট হুযূর (র)-এর মুরীদ মোসাম্মৎ শামিলা বেগমের পুত্র মাওলানা শামসুদ্দীন সাহেব ও আনোয়ার মিয়া অন্যান্যদের সহযোগিতা নিয়ে মাদ্‌রাসার খেদমতে নিয়োজিত আছেন। প্রায় ছয় শতাধিক ছাত্রী বর্তমানে অধ্যয়নরত। এই মহিলা মাদ্‌রাসা আপাতত টিনের ছাউনী কাঁচা হলেও পাকা দালান নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই মাদ্‌রাসা বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক দাখিল পর্যায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত।

সম্পৃক্ত চার ব্যক্তিত্ব

হযরত হামিদ বাঙালী (র)

হযরত সূফী হামিদ বাঙালী (র) বাংলার ইতিহাসে একজন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ পাকের ওলী হন। হযরত ওয়াইসী (র)-এর অত্র জীবনীগ্রন্থে হযরত সূফী হামিদ বাঙালী (র)-এর প্রসঙ্গ টানা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছিলাম। যেহেতু হযরত ওয়াইসী (র) ও হযরত সূফী হামিদ বাঙালী (র)-এর মধ্যে তরীকতের দিক দিয়ে ৭ স্তর ব্যবধান রয়েছে অর্থাৎ হামিদ বাঙালী হযরত ওয়াইসী (র)-এর ৭ স্তর উপরে। তারপরও হযরত ওয়াইসী (র)-এর উপর গ্রন্থ লিখতে গিয়ে বারে বারে জানতে পারি হযরত ওয়াইসী (র) বারে বারে বর্ধমানের মঙ্গলকোট গমন করতেন হযরত হামিদ বাঙালী (র)-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে। অপরদিকে ভারত থেকে হযরত ওয়াইসী (র)-এর উপর প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষার প্রত্যেক গ্রন্থে হযরত হামিদ বাঙালী (র)-এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে হযরত ওয়াইসী (র) তথায় যাওয়া-আসার কারণে।

উপমহাদেশের ইতিহাসে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদী আলফেসানী (র) একজন উজ্জ্বল স্মরণীয় নাম। তাঁরই অন্যতম মুরীদ ও খলীফা হলেন হযরত সূফী হামিদ বাঙালী (র)। বাংলার সূফী সাধকগণের মধ্যে তিনি অতি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন তাতে ইতস্ততের অবকাশ নেই। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে চিরনিদ্রায় শায়িত।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (র)-এর এক মুরীদের নাম ছিল আবদুল হামিদ। তিনি তাঁর এ প্রিয় মুরীদ ও খলীফার নামের পরে বাঙালী শব্দ যুক্ত করে দেন। বিভিন্ন গ্রন্থ ঘাটাঘাটি করে তাঁর জন্ম ও ইন্তিকালের কোন সন তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে তিনি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের বিখ্যাত কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর তুঘলক সুলতানের রাজত্বকালে ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের বংশধারা চার ভাগে ভাগ হয়ে দিল্লী, অযোধ্যা, চট্টগ্রাম ও মঙ্গলকোটে আসেন বলে জানতে পারা যায়। কাজীকুলের একজন অযোধ্যায়, আরেকজন মঙ্গলকোটে বসতি স্থাপন করেন। যিনি অযোধ্যায় বসবাস শুরু করেন তিনি কিদওয়ানী নামে

প্রতিষ্ঠিত হন। অপর দিকে মঙ্গলকোটে যিনি আসেন তাঁর নাম কাজী জিয়া উদ্দিন। তিনিই কাজীকুলের প্রথম ও প্রধান বংশধর। চট্টগ্রামে যে শাহ গিয়েছিলেন হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-কে তাঁদেরই একজন বংশধর বলে ধারণা করা হয়।

হযরত হামিদ বাঙালী (র) হযরত ইমামে রব্বানী (র) থেকে ধর্মীয়সহ নানাবিধ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে মুরীদ হয়ে যান। পরবর্তীতে খেলাফত লাভে ধন্য হন। দীর্ঘদিন নিজের পীরের সংস্পর্শে থাকার পর তিনি পাঞ্জাব থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের সময় পীরের একজোড়া খড়ম সঙ্গে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে বেয়াদবীর কথা চিন্তা করে মঙ্গলকোটে তাঁরই খানকাহ্-এর নিকটস্থ দিঘীতে খড়ম দু'টি ফেলে দেন। দিল্লীর সম্রাট শাহজাহান বাংলার এই মহান সূফীর দু'আ নিতে মঙ্গলকোটে হাজির হন। সম্রাট শাহজাহান ভারতবর্ষের মোঘল আধিপত্যের নানান প্রতিকূলতা নিয়ে হযরত হামিদ বাঙালীর (র) দু'আপ্রার্থী হন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর সৈন্য ও অন্যান্যদের হযরত হামিদ বাঙালীর (র) খানকাহ থেকে দূরত্বে রেখে খালি পায়ে তাঁর দরবারে সাক্ষাৎ লাভের আশায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্রাট শাহজাহান হামিদ বাঙালী (র)-কে বিশাল এরিয়ার সম্পদ প্রদান করেন তাঁর খানকাহ, মসজিদ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

আজও বর্ধমান জেলার অদূরে মঙ্গলকোটে যিয়ারতে বিপুল সমাগম রয়েছে। হযরত ওয়াইসী (র) বারে বারে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকোট গমন করতেন। তাঁর পুণ্যবতী প্রিয় কন্যা হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র) ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকোট গমন করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর অন্যতম খলীফা হযরত আতায়ে ইলাহী (র) ও মঙ্গলকোটে বসবাস করতেন। তথায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে তথায় শায়িত করা হয়।

হযরত সূফী সাইয়েদ মাওলানা আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র)

হযরত সূফী সাইয়েদ মাওলানা আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র) চট্টগ্রাম অঞ্চল পেরিয়ে এই উপমহাদেশসহ বিশ্বের বহু স্থানে প্রখ্যাত ওলীয়ে কামেল হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তিনি যেমনি কঠোর শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন তেমনি মহান আল্লাহ্ পাকের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বমহলে প্রকাশ পেতে থাকেন।

তিনি ১২৪৩ হিজরী ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার মাইজভাণ্ডার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনের ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাথে সাথে ওস্তাদগণের বিশেষ আগ্রহে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

এতে করে প্রতীয়মান হয় যে হযরত সূফী সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র) বেশ ক'বছর কলকাতায় অবস্থান করেছেন। অপরদিকে হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র) বালাকোটের যুদ্ধের আগে-পরে দীর্ঘসময় কলকাতায় অবস্থান করেছিলেন।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে হযরত ওয়াইসী (র)-এর পাশাপাশি হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র) ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (র)-এর উপর নানান গ্রন্থ-প্রবন্ধ নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে থাকি। এতে করে দৃষ্টিগোচর হয় যে হযরত সূফী সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র) কলকাতা অবস্থানকালীন হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর নিকট বারে বারে গমন করতেন এবং তাঁর হাতে বায়াত হন। উভয় মহান সাধক পুরুষ কলকাতা অবস্থান করতেছিলেন বিধায় একে অপরের মোলাকাত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রন্থকার-প্রবন্ধকার বলতে চাচ্ছেন যে হযরত সূফী সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র) মূলতঃ হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর মুরীদ ছিলেন।

অপরদিকে মাইজভাণ্ডার থেকে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে তরীকতের শজরার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। ঐ সব গ্রন্থে বলা হয়েছে—হযরত সূফী সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র)-এর পীর হলেন হযরত সূফী সাইয়েদ মোহাম্মদ ছালেহ লাহুরী (র), তৎপীর হচ্ছেন হযরত হাজী সূফী লকিয়ত উল্লাহ্ (র), তৎপীর হচ্ছেন হযরত সূফী আহমদ উল্লাহ্ (র), তৎপীর হচ্ছেন হযরত সূফী সাইয়েদ দায়েম (র)। অপর দিকে মাইজভাণ্ডার থেকে প্রকাশিত অলিকুল শিরোমণি হযরত বাবা ভাণ্ডারী (র) নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে-হযরত সূফী সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র)-এর পীর হচ্ছেন হযরত সূফী সাইয়েদ মোহাম্মদ ছালেহ লাহুরী (র), তৎপীর হচ্ছেন দেলাওর আলী লাহুরী (র), তৎপীর হচ্ছেন হযরত

হাজী সূফী লকিয়ত উল্লাহ্ (র), তৎপীর হচ্ছেন হযরত সূফী আহমদ উল্লাহ্ (র), তৎপীর হচ্ছেন হযরত সূফী মোহাম্মদ দায়েম (র)। এক গ্রন্থে হযরত সূফী মোহাম্মদ ছালেহ লাহুরী (র)-এর পীর দেখানো হয়েছে হযরত সূফী দেলাওর আলী লাহুরী (র)-কে। অপরদিকে অপর দুই গ্রন্থে হযরত সূফী মোহাম্মদ ছালেহ লাহুরী (র)-এর পীর দেখানো হয়েছে হযরত হাজী সূফী লকিয়ত উল্লাহ (র)-কে।

মাইজভাণ্ডার দরবার থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে হযরত সূফী সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী পীর হিসেবে হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর স্থলে হযরত সূফী মোহাম্মদ ছালেহ লাহুরী (র)-কে দেখানো হয়েছে। তবে তা আরো উপরে গিয়ে হযরত সূফী মোহাম্মদ দায়েম (র)-এর নাম দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে হযরত দায়েম (র)-এর ঠিকানা উল্লেখ করা না হলেও তিনি ঢাকা মহানগরীর আজিমপুর দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত সূফী সাইয়েদ দায়েম (র) বলে মনে করি। অপরদিকে হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর সাথে হযরত সাইয়েদ মোহাম্মদ দায়েম (র)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং কোন কোন গ্রন্থকার প্রথম দিকে বায়াত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সূফী সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র) মতান্তরে হযরত ওয়াইসী (র)-এর পীরভাই হন।

এখানে উল্লেখ্য, হযরত সূফী আল্লামা সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র) ১৩২৫ হিজরী, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান

খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান চট্টগ্রাম পেরিয়ে বাংলার পূর্বাঞ্চলের একটি বিখ্যাত নাম। তাঁর পিতা শেখ ওবায়দুল্লাহ্ খান বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত এবং দারোগা ছিলেন।

খান বাহাদুর হামিদুল্লার বংশ বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় থেকে বৃহত্তর নোয়াখালীর বর্তমান ফেনী জেলার দাদারিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। ঐ দাদারিয়া বর্তমানে কালের আবর্তে নদীর স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে, হিজরী ১২২৪ শাওয়াল মাসের বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম মহানগরীর গুলকবহর সংলগ্ন কাতালগঞ্জে ও মীরেসরাই তাঁদের জমিদারি রয়েছে। কিন্তু তিনি কাতালগঞ্জের বাড়িতে বসবাস করতেন।

কোন কোন গ্রন্থকার খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খানকে সন্দ্বীপবাসী বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার কোন সত্যতা নেই।

চট্টগ্রামের ইতিহাস নিয়ে লিখিত ফার্সি ভাষায় তারিখী হামিদী তাঁরই লিখিত একটি অমূল্য গ্রন্থ। ৪৪১ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি চট্টগ্রামের ইতিহাসের উপর প্রথম গ্রন্থ হিসেবে ইতিহাসবিদগণ স্বীকার করে আসছেন। এই গ্রন্থটি রচিত হয় ১৮৫৫-৫৬ সালে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে।

খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান নিঃসন্তান ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র। এতে করে তাঁর বিশাল জমিদারী তাঁর অবর্তমানে তাঁরই গোষ্ঠীর অন্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে দান করে দেন। হামিদুল্লাহ্ খানের চট্টগ্রাম মহানগরীতে বহু স্মৃতি বিজড়িত অবদান রয়েছে।

তিনি বালাকোটের গাজী হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর অন্যতম প্রিয় মুরীদ ছিলেন। অর্থাৎ হযরত ওয়াইসী (র)-এর পীরভাই ছিলেন।

খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খান তাঁরই বুযুর্গ ও বিখ্যাত পীর হযরত সূফী নিজামপুরী সাহেবের নির্দেশে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদকে ব্রিটিশ জবরদখল থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খান ইন্তিকাল করলে পরে চট্টগ্রাম মহানগরীর কাতালগঞ্জস্থ তাঁরই মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশাল জমিদারি এস্টেটের মালিক হয়েও তাঁর কবরটি ঐ কবরস্থানে নাম ফলক দিয়ে চিহ্নিত করা নেই।

খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খানের সরাসরি ওয়ারিশ না থাকলেও তাঁরই বংশের ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ্ খানের ওয়ারিশগণ চট্টগ্রাম মহানগরীর কাতালগঞ্জ ও মীরেসরাই উপজেলার মঘাদিয়াস্থ জমিদারী এস্টেট নিয়ে বসবাস ও ভোগ-দখল করে আসতেছেন।

বাহাদুর হামিদুল্লাহ্ খানের ইন্তিকালের পাঁচ বছর পর তাঁর পীরভাই ও পীরের অন্যতম খলীফা হযরত ওয়াইসী (র) কলকাতা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।

আমিরাবাদে শায়িত সূফী সাহেব

দক্ষিণ চট্টগ্রামের আমিরাবাদ জংশন থেকে কয়েকশ মিটার পশ্চিম-উত্তরে হযরত সূফী সাহেব হুযূরের মাযার হিসেবে জেনে দেখে যিয়ারত করে আসতেছিলাম। পরবতীতে জানতে পারি এই মহান ওলী হচ্ছেন ঢাকা মহানগরীর

আজিমপুরস্থ হযরত সূফী সাইয়েদ দায়েম উল্লাহ্ (র)-এর পিতা। দীর্ঘদিন মনের ভিতরে কৌতূহল ছিল সেকালে প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে সুদূর আমিরাবাদে তাঁর আসার কারণই বা কি ?

কিন্তু অত্র মোবারক গ্রন্থ রচনাকালে তথ্য তালাশ করতে গিয়ে আমার কৌতূহলের অবসান হয়েছে বলে মনে করি। যেহেতু অত্র গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকার আজিমপুরস্থ বিখ্যাত দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত সাইয়েদ মোহাম্মদ দায়েম (র) হন। তাঁরই সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র হযরত সূফী সাইয়েদ লকিয়ত উল্লাহ্ (র)-এর সাথে হযরত ওয়াইসী (র)-এর পীর সাহেব হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)-এর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিল। কোন কোন লেখক হযরত নিজামপুরী (র), হযরত সাইয়েদ লকিয়ত উল্লাহ্ (র)-এর হাতে প্রথম অবস্থায় মুরীদ হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাথে হযরত সাইয়েদ লকিয়ত উল্লাহ্ (র)-এর সাথেও কমবেশি যোগাযোগ ছিল।

এই সব ইতিহাস আজিমপুর দায়রা শরীফের বংশধরগণের জানা থাকারই কথা। আজিমপুর দায়রা শরীফের পশ্চিম সংলগ্ন ছোট দায়রা শরীফ রয়েছে। ঐ দায়রা শরীফেরই হযরত সাইয়েদ আসমত উল্লাহ্ (র)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সূফী সাইয়েদ দায়েম উল্লাহ্ সাহেবের পিতা আমিরাবাদে শায়িত। সূফী সাব হুযূর হচ্ছেন সূফী সাইয়েদ আবু মূসা কলিমুল্লাহ্ (র)।

তাঁর পিতার নির্দেশে হযরত সূফী সাইয়েদ কলিমুল্লাহ্ (র) তখনকার অত্যন্ত প্রতিকূল যোগাযোগেও ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সুদূর আমিরাবাদে গমন করেছিলেন। তিনি মাত্র ৪০-৪২ বছর বয়সে ১৩৪৬ হিজরী ১৩ জিলকদ, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে পিতার জীবদ্দশায় দুই পুত্র এক কন্যা রেখে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বুজুর্গ পিতা হযরত সাইয়েদ সূফী আসমত উল্লাহ্ ১৩৬২ হিজরী ২৫ শাবান, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার ১১০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফের জামে মসজিদের দক্ষিণ সংলগ্নে শায়িত আছেন।

তাঁর নাতি সাইয়েদ সূফী আবু মূসা কলিমুল্লাহ্ (র)-এর প্রথম পুত্র সূফী সাইয়েদ দায়েম উল্লাহ (র) চট্টগ্রাম অঞ্চলে অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এই অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানাসহ তাঁর বহু অমর কীর্তি রয়েছে। বিশেষ করে তার বুযুর্গ পিতার মাযার সংলগ্ন আমিরাবাদ সূফিয়া আলিয়া মাদ্রাসা কমপ্লেক্স

তাঁর অমর কীর্তি। তিনি ১৪১৫ হিজরী ২৭ শাবান, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার ৮৩ বছর বয়সে আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার ইবরাহীমপুরে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-মাদ্রাসা-এতিমখানা কম্পাউন্ডে তাঁকে শায়িত করা হয়।

এখন প্রশ্ন আসে, হযরত সাইয়েদ কলিমুল্লাহ (র)-কে তাঁর বুযুর্গ পিতা আমিরাবাদ গমনের নির্দেশ দিলেন কেন। তখন যেমনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যোগাযোগ সহজতর ছিল না তেমনি চট্টগ্রাম শহর থেকে নদীপথে জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভরশীল হয়ে ইঞ্জিনবিহীন হাত দ্বারা চালিত নৌকা-সাম্পানযোগে আমিরাবাদে নিকটতম স্থান খান হাটে পৌঁছতে হতো।

এ বিষয়ে গভীর দৃষ্টিপাত করে মনে করি যে, হযরত নিজামপুরী (র) ও হযরত ওয়াইসী (র) আজিমপুর দায়রা শরীফের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, যোগ্য, সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কাজেই তরীকতের তবলীগের খেদমতের পাশাপাশি অত্যন্ত প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেও হযরত ওয়াইসী (র)-এর দাদা-দাদি সহ অপরাপর আল্লাহ্পাকের ওলীগণের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

শাজরা

সিল্সিলায়ে আলিয়ায়ে কাদেরিয়ার পবিত্র শাজরা

১. আফজালুল আম্বিয়া ওয়াররাসূল রাহ্মাতুল্লিল আলামীন আহমাদ মুজতাবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ও আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। ওফাৎ ১২ রবিউল আউয়াল, মাযার শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারা।

২. আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাজা (রা) এবং রাসূল (সা) তনয়া হযরত ফাতেমা (রা)

৩. ইমামুল মোত্তাকীন হযরত ইমাম হাসান (রা)।

৪. সাইয়েদুস সাদাত জামেউল বারাকাত হাসান মুসান্না (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

৫. শাহ আবদুল্লাহ্ মাহাজ (র)।

৬. কুতুবুল আলম শাহ মূসা আল-জাওয়ান (র)।

৭. আবদুল্লাহ্ আল মোরিছ (র)।

৮. কুতুবুল আলম শাহ্ মূছা (র)।

৯. শাহ্ সাইয়েদ দাউদ (র)।

১০. কুতুবুল আলম সাইয়েদ মোহাম্মদ মোরিছ (র)।

১১. কুতুবুল আলম সাইয়েদ ইয়াহ্ইয়া যাহেদ (র)।

১২. কুতুবুল আলম শাহ্ সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ (র)।

১৩. কুতুবুল আলম শাহ্ আবু ছালেহ্ (র)।

১৪. কুতুবে রাব্বানী গাউসে সামদানী হযরত বড়পীর সাইয়েদ মহীউদ্দীন আবু মোহাম্মদ আবদুল কাদের জিলানী (র)।

১৫. কুতুবে রাব্বানী সাইয়্যেদুস সাদাত কুতুবুল আলম সাইয়েদ আবদুর রাজ্জাক (র)।

১৬. কুতুবুল আলম সাইয়েদ শরফুদ্দিন কিতাল (র)।

১৭. কুতুবুল মোহাক্কেকীন সাইয়েদ আবদুল ওহাব (র)।

১৮. কুতুবুল আলম সাইয়েদ বাহাউদ্দীন (র)।

১৯. কুতুবুল আলম সাইয়েদ আক্বীল (র)।

২০. কুতুবুল আলম সাইয়েদ শামসুদ্দীন শাহরায়ী (র)।

২১. কুতুবুল আলম হযরত শাহ্ গুদা রহমান (র) (প্রথম)।

২২. কুতুবুল আলম হযরত সাইয়েদ শামসুদ্দিন আরেফ (র)।

২৩. হযরত সাইয়েদ গুদা রহমান (র)।

২৪. হযরত শাহ ফুযায়েল (র)।

২৫. হযরত শাহ কামাল (র)।

২৬. হযরত আবদুল আহাদ (র)।

২৭. ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী শায়েখ আহমদ সেরহিন্দী (র)।

২৮. হযরত আদম বিন নূরী (র)।

২৯. হযরত সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী (র)।

৩০. হযরত মাওলানা আবদুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী (র)।

৩১. প্রখ্যাত মুহাদ্দেস হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (র)।

৩২. আলেমকুল শিরোমণি এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ দেহলভী (র)।

৩৩. মাহবুবে সোবহানী হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র)।

৩৪. হযরত মাওলানা সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র)

৩৫. রাসূল নোমা আল্লামা হযরত সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

সিলসিলায়ে আলিয়ায়ে চিশতিয়ার পবিত্র শাজরা

১. আফজালুল আম্বিয়া ওয়াররাসূল রাহমাতুল্লিল আলামীন আহমদ মুজতাবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। ওফাৎ ১২ রবিউল আউয়াল। মাযার শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারা।
২. আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাজা (রা)।
৩. হযরত হাসান বসরী (র)।
৪. হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (র)।
৫. হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়াজ (র)।
৬. হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম (র)।
৭. ফকিরদের ইমাম, আউলিয়ায়ে কিরামের অগ্রনায়ক হযরত হুযাইফা মারআশী (র)।
৮. তত্ত্বজ্ঞানীদের মুকুটমণি খাজা হযরত আবূ হুরায়রা বসরী (র)।
৯. হযরত মমশাদ উলবে দিনওয়ারী (র)।
১০. খাজা আবু ইসহাক শামী (র)।
১১. কুদওয়াতুদ্দীন হযরত খাজা আবু আহ্মদ (র)।
১২. খাজা মোহাম্মদ চিশতী (র)।
১৩. খাজা ইউসুফ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে সুমআন চিশতি (র)।
১৪. কুতুবুল আকতাব খাজা মওদুদ চিশতী (র)। শাময়ে সুফিয়া এবং চেরাগে চিশতিয়া নামে লোকে তাঁকে অভিহিত করত।
১৫. হাজী শরীফ জিন্দানী (র)।
১৬. তরীকতপন্থীগণের ইমাম, হাকীকত বিশারদ, আউলিয়া কিরামের অগ্রনায়ক হযরত খাজা উসমান হারুনী (র)।
১৭. সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনউদ্দীন হাসান চিশতী সানজরী (র)।
১৮. কুতুবুল আকতাব খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)।

১৯. সুলতানুস সালেকীন শামসুল আরেফীন হযরত শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (র)।
২০. সুলতানুল আউলিয়া, মাহবুবে এলাহী হযরত শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র)।
২১. হযরত ঘী সিরাজ উসমান উধী (র)।
২২. হযরত আলাউল হক ইবনে আসাদ লাহোরী বাঙালী (র)।
২৩. পুত্র খাজা নূর কুতুবুল আলম (র)।
২৪. শেখ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী (র)।
২৫. হযরত সাইয়েদ রাজি হামিদ শাহ (র)।
২৬. হযরত হাসান ইবনে তাহের (র)।
২৭. শেখ কাজী খান ইউসুফ আছেহী (র)।
২৮. ইলমের অকুল সমুদ্র, ওলীয়ে কামেল শেখ আবদুল আজিজ (র)।
২৯. সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী (র)।
৩০. শেখে কামেল ওয়াল মুকাম্মাল হযরত শাহ্ আবদুর রহিম দেহলভী (র)।
৩১. প্রখ্যাত মুহাদ্দীস হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (র)।
৩২. আলেমকুল শিরোমণি এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ দেহলভী (র), জন্ম ১১৫৯ হিজরী, ওফাৎ ১২৩৯ হিজরী, ৭ শাওয়াল। মাযার শরীফ-দিল্লী, ভারত।
৩৩. মাহবুবে সোবহানী হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র)।
৩৪. সালেকীনদের শিরোমণি, আরেফীনদের মূল, হযরত মাওলানা সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাযার শরীফ-মালিয়াইশ, থানা-মীরেসরাই, জেলা-চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৩৫. আরেফে রাব্বানী মাহবুবে সোবহানী, মাহবুবে সাইয়েদুল মুরসালীন কুতুবুল ইরশাদ রাসূল নোমা আল্লামা হযরত সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী।

সিল্‌সিলায়ে আলিয়ায়ে নক্‌শবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদিয়ার পবিত্র শাজ্‌রা

১. সাইয়েদুল মুরসালীন শফিউল মুজনেবীন রাহমাতুল্লিল আলামীন আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহি ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লামা।

২. আমিরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।

৩. হযরত সালমান ফারসী (রা)। তিনি ২৫০ বৎসর বয়সে (মতান্তরে ৩৫০ বৎসর) ৩৩ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। মাযার শরীফ-সালমান পার্ক, ইরাক।

৪. হযরত কাসেম বিন মোহাম্মদ বিন আবূ বকর (র)। কবর শরীফ-মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী স্থানে।

৫. হযরত ইমাম জাফর সাদিক (র)। জন্ম ৮০ হিজরী, ১৭ রবিউল আউয়াল (মতান্তরে ৮ রমযান) মদীনা মুনাওয়ারা জান্নাতুল বাকীতে কবর শরীফ।

৬. হযরত শেখ বায়েজীদ বোস্তামী (র), মাযার শরীফ-বোস্তাম।

৭. হযরত আবুল হাসান খরকানী (র)। জন্ম ১৫৩ হিজরী, ওফাত ২০৩ হিজরী, মাযার শরীফ-খরকান।

৮. হযরত আবু আলী ফারমিদী তুসী (র)।

৯. হযরত আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (র)। জন্ম ৪৪০ হিজরী।

১০. হযরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী (র)।

১১. হযরত আরিফ রেওগরী (র)। মাযার শরীফ-রেওগর।

১২. হযরত মাহমুদ আবুল খায়ের ফগনুভী (র)। ওফাত ৭১৬ (মতান্তরে ৭১৭) হিজরী, ১৭ রবিউল আউয়াল।

১৩. হযরত আলী রমিতানী (র)। মকান রমিতন। জন্ম ৬৯১ হিজরী, মাযার শরীফ-খরিজম (খরজুম)।

১৪. হযরত মোহাম্মদ বাবা সাম্মাসী (র)। মাযার শরীফ-কসবা, সামায।

১৫. হযরত আমীর সাইয়েদ কল্লাল (র)। ওফাত ৭৭২ হিজরী, ১৫ জমাদিউস সানী। মাযার শরীফ-রমিতনের নিকটবর্তী বুখারা।

১৬. হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র)। তিনি নক্‌শবন্দীয়া তরীকার ইমাম। মাযার শরীফ-সমরকন্দ, উজবেকিস্তান।

১৭. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (র)। মকান কাবুল ও গজনীর মধ্যবর্তী চরখ গ্রামে। ওফাত ৮৫১ হিজরী, মাযার শরীফ-ইয়ালকেনু।

১৮. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (র)। মাযার শরীফ-ওয়াক্‌শ, সমরকন্দ।

১৯. হযরত যাহেদ (র)। ওফাত ৯৩৬ হিজরী, ১ রবিউল আউয়াল, মাযার শরীফ-ওয়াক্‌শ।

২০. হযরত দরবেশ মোহাম্মদ (র)। ওফাত ৯৭০ হিজরী, ১৯ মুহাররম, মাযার শরীফ-এছফেয়ার।

২১. হযরত খাজা আনকনগী (র)। জন্ম ৯১৮ হিজরী, ওফাত ১০০৮ হিজরী, ২২ শাবান। মাযার শরীফ-কসবা, আমকাঙ্গ, ভারত।

২২. হযরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ (র)। জন্মস্থান কাবুল, নিবাস দিল্লী, জন্ম ৯৭১ হিজরী, (মতান্তরে ৯৭২ হিজরী) ওফাত ১০১২ হিজরী, ২৫ জমাদিউস সানী। মাযার শরীফ-সিঙ্গারাচক, নতুন দিল্লী, ভারত।

২৩. ইমামুত্ তরীকত হযরত ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী শেখ আহমদ ফারুকী সরহিন্দী (র)। তিনি হযরত উমর (রা)-এর বংশধর, এ জন্য তাঁকে ফারুকী এবং হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ১০০০ বছর পরে দীনের সংস্কার সাধন করেন বলে তাঁকে মুজাদ্দেদে আলফেসানী বলা হয়। জন্ম ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দ ৯৭১ হিজরী, ১৪ শাওয়াল। ওফাত ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ ১০৩৪ হিজরী ২৮ সফর। মাযার শরীফ-সরহিন্দ, পূর্ব পাঞ্জাব, ভারত।

২৪. হযরত আদম বিন্নুরী (র)। মকান বন্দর (বেনুর), ওফাত ১০৫৩ হিজরী, কবর শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারা জান্নাতুল বাক্বীতে।

২৫. হযরত সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী (র)। মকান ও কবর শরীফ-যমুনা নদীর তীরে, আগ্রা, ভারত।

২৬. হযরত আবদুর রহিম মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)। মাযার শরীফ-মেহদীয়ান, দিল্লী, ভারত।

২৭. হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)। জন্ম ১১১৪ হিজরী, ৪ শাওয়াল। ওফাত ১১৭৬ হিজরী, মাযার শরীফ-মেহদীয়ান, দিল্লী, ভারত।

২৮. হযরত আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)। জন্ম ১১৫৯ হিজরী, ওফাত ১২৩৯ হিজরী, ৭ শাওয়াল। মাযার শরীফ-মেহদীয়ান, দিল্লী, ভারত।

২৯. হযরত আমিরুল মু'মিনিন সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)। তিনি পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের সাথে ধর্মযুদ্ধে ১২৪৬ হিজরী জিলক্বদ মাসে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের উত্তরে বালাকোটে শহীদ হন।

৩০. হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী চাটগামী (র)। কবর শরীফ-মালিআইশ, মিরেসরাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

৩১. রাসূল নোমা হযরত সূফী সাইয়েদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (র)। ওফাত ১৩০৪ হিজরী ৮ রবিউল আউয়াল, ২০ অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বাংলা, ৬ ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার বিকেল ৪-০০টা। কবর শরীফ-২৪/১, মুন্সীপাড়া লেন, মানিকতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর খলীফা হচ্ছেন :

ক. শামসুল ওলামা হযরত সূফী গোলাম সালমানী (র)। কবর শরীফ-ফুরফুরা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

খ. তৎ খলীফা হযরত সূফী সাইয়েদ আবদুল বারী ওয়াইসী (র)। কবর শরীফ-বান্ডেল, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

গ. তৎ খলীফা হযরত হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (র)। কবর শরীফ- ঘোড়া বিভাগীয় শহরে, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

ঘ. তৎ খলীফা হযরত মাওলানা সূফী মোহাম্মদ আবদুল মজিদ চাটগামী (র) (হযরত বড় হুযূর)। কবর শরীফ-গারাংগিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

আমি গ্রন্থকার তাঁর নগণ্য মুরীদ হই।

কারামত

হযরত ওয়াইসী (র)-এর কারামত লিখতে গেলে একটি বড় আকারের গ্রন্থ লিখেও শেষ করা যাবে না। তারপরও মাত্র কটি কারামত এখানে উল্লেখ করা হলো :

হযরত ওয়াইসী (র) বিশেষ দৃষ্টির প্রভাবে নবী রাসূলগণকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা মহান আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেছেন এবং তাঁর মুরীদগণকে তিনি নবীজী (সা)-এর দর্শন করাতে সক্ষম থাকতেন।

তিনি যার প্রতি সুদৃষ্টি দিতেন তিনি আল্লাহ্ পাকের ওলী হয়ে যেতেন।

তিনি নবীজী (সা)-এর সুন্নত মতে জীবন যাপনে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তাঁর ছোহবতে আসা মাত্রই মহান আল্লাহ্ পাকের স্মরণ হয়ে যেত।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর নাতনী হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনের পুত্র হযরত সাইয়েদ এহসান আহমেদ মাসুম বর্ণনা করেন :

(ক) একদা কলকাতাস্থ কড়েয়া রোডের মসজিদে হযরত ওয়াইসী (র)-এর তোয়াজ্জু-এর প্রভাবে তিনজন সালেক ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ পাকের প্রেমে দগ্ধ হয়ে ইন্তিকাল করেন।

খ) হযরত ওয়াইসী (র) তাঁর কন্যা হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনকে একটি থলে দিয়েছিলেন। ফযরের নামায বাদে বিসমিল্লাহ্ বলে ঐ থলেতে হাত দিলে দুইটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যেত।

গ) হযরত ওয়াইসী (র) একদা কয়েকজন মুরীদসহ আসরের নামায পড়তে কলকাতা ধর্মতলার টিপু সুলতান মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। ঐ মসজিদের গেইটের বাম পার্শ্বে ফুটপাতে জনৈক চর্মকারকে তাঁর নাম ধরে সালাম প্রদান করেন। তাতে চর্মকার সালামের উত্তর দিয়েই দৃষ্টির আড়াল হয়ে যান। এতে করে মুরীদগণ হযরত ওয়াইসী (র) থেকে তার মর্ম জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঐ চর্মকার আসামের একজন কুতুব। আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় আজ প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার দরুন এ স্থান হতে প্রস্থান করেছেন।

ঘ) পুনাশিতে হযরত ওয়াইসী (র)-এর শ্বাশুড়ী সাহেবার পায়ে প্রবল বাত-ব্যথা হয়েছিল। বহু চিকিৎসাতেও অসুখের উপশম হচ্ছিল না। এতে করে হযরত

ওয়াইসী (র) বেদনা স্থান স্পর্শ করে "ইনশাল্লাহ্ বেদনা নাই" বলার সাথে সাথে বেদনা চিরদিনের জন্য চলে যায়।

পুনাশি গ্রামের হযরত সূফী একরামুল হক (র) বর্ণনা করেছেন–একবার পাঞ্জাবের সরহিন্দের ইমামে রব্বানী (র)-এর বংশধর খোরাশানের পীর হযরত মাওলানা গোল হোসেন (র)-এর দুজন মুরীদ কলকাতায় এসে হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হযরত নবীজী (সা)-এর দিদার লাভের প্রবল বাসনা ব্যক্ত করেন। যেহেতু হযরত ওয়াইসী (র)-এর উসিলায় তখন জগতের বহু ব্যক্তি নবীজী (সা)-এর দিদার লাভ করতেছিলেন। হযরত ওয়াইসী (র) তাদেরকে তাঁর উসিলা দিয়ে মোরাকাবায় বসতে নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পরে নবীজী (সা)-এর যিয়ারত হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তারা যিয়ারত হয়নি বলে উত্তর দেন। এতে করে হযরত ওয়াইসী (র) রুষ্ঠ হয়ে বলে উঠেন, "কি কঠিন হৃদয়।" অতঃপর আবার মোরাকাবায় বসার সাথে সাথে তারা উভয়েই নবীজী (সা)-এর দর্শন লাভ করেন।

পুনাশির হযরত সূফী একরামুল হক (র) আরো বর্ণনা করেন-একবার পাঞ্জাবের ইমামে রব্বানী (র)-এর বংশধর ও খোরাশানের পীর হযরত মাওলানা গোল হোসেন (র) কলকাতা নগরীতে চলে আসেন হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এবং বললেন, তাঁর দুই মুরীদের মুখে শুনেছেন যে তিনি নবীজী (সা)-এর যিয়ারত ঘটায়ে থাকেন। এতে করে তিনি ব্যাকুল হয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং হযরত ওয়াইসীর (র) কাছে মুরীদ হতে বারে বারে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। এবং সাথে সাথে নবীজী (সা)-এর যিয়ারত করায়ে তাকে ধন্য করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। তখন হযরত ওয়াইসী (র) ও বারে বারে বলতে থাকেন যে তিনি তরীকতের একজন নগণ্য খাদেম মাত্র। অতএব তাঁকে মুরীদ করানো বেয়াদবীর শামিল হবে। কিন্তু হযরত খোরাশানী (র) এতে করে ফিরে না গিয়ে ষোল দিন পর্যন্ত হযরত ওয়াইসী (র)-এর নিকটে অবস্থান করতে থাকেন। অতঃপর সতেরোতম দিবসে হযরত খোরাশানী (র)-এর করুণ আবেদনে হযরত ওয়াইসী (র) হযরত খোরাশানী (র)-এর পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, "আপনাকে আমার সিলসিলাভুক্ত করে নিলাম। যখনই আমার যিয়ারতের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা করবেন তখনই আমার দর্শন লাভ করবেন।" অতঃপর হযরত ওয়াইসী (র) হযরত খোরাশানী (র)-কে তাঁর নিজের উসিলা দিয়ে মোরাকাবায় বসায়ে হযরত রাসূলে পাক (সা)-এর যিয়ারত করায়ে দেন এবং মুরীদ হিসেবে গণ্য করে নেন।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাথে হযরত খিজির (আ)-এর অত্যধিক যোগসূত্র ছিল। নিম্নের একটি ঘটনা তারই কিছুটা ইঙ্গিত বহন করে।

হযরত খোরাশানী (র) পীর সাহেব তাঁর মুরীদগণসহ হযরত ওয়াইসী (র)-এর সংস্পর্শে এসে আধ্যাত্মিকভাবে অত্যধিক লাভবান হন। এতে করে তিনি হযরত ওয়াইসী (র)-এর সংস্পর্শে থাকতে সচেষ্ট হলেন। একবার হযরত খুরাসানী (র) তাঁর মুরীদদের নিয়ে হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাথে নৌবিহারে যান (এটা মূলতঃ নদী না সাগর তাতে মতভেদ রয়েছে)। নৌকা নদীর মাঝে বা সাগরের তীর থেকে দূরে গেলে হযরত ওয়াইসী (র) তৎক্ষণাৎ নদীতে ঝাঁপ দিলেন এবং পানির উপর স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। অতঃপর পানির মধ্যে ডুব দিলেন। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে হযরত খুরাসানী (র) অবাক হয়ে গেলেন। তিনিও নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তাঁর মুরীদরা তাঁকে বারে বারে বারণ করায় তিনি নিবৃত্ত হন এবং বললেন, শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করো দেখা যাক কি হয়। দীর্ঘক্ষণ হযরত ওয়াইসী (র)-এর কোন খোঁজখবর না পেয়ে হযরত খুরাসানী (র) তাঁর মুরীদগণ ও হযরত ওয়াইসী (র)-এর সঙ্গী সাথী নিয়ে চলে আসেন। কিন্তু হযরত খুরাসানী (র) হযরত ওয়াইসী (র)-এর খোঁজে নদী তীরে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় নদীতীরে এক ফকিরকে বসে থাকতে দেখলেন। তখন হযরত খুরাসানী (র) ঐ ফকির থেকে জানতে চাইলেন নদী তীরে কোন লোকজনকে দেখেছে কিনা। অতঃপর ঐ ফকির কেন জানতে চাইলে হযরত খুরাসানী (র) বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেন। বিস্তারিত বর্ণনা শোনার পর ফকির মন্তব্য করলেন যে আপনি হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাথে নদীতে ডুব দিলে ভাল করতেন। এতে করে আপনি মহান আল্লাহপাকের সান্নিধ্য লাভ করতে পারতেন। তখন হযরত খুরাসানী (র) ব্যথিত মনে বারে বারে ফকিরের দিকে তাকাতে লাগলেন। অপরদিকে ফকির তৎক্ষণাৎ হাঁটতে শুরু করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরবর্তীতে হযরত ওয়াইসী (র) পাহাড়ে মতান্তরে যে স্থান হতে নৌকায় আরোহণ করেন ঐ স্থানে স্বাভাবিকভাবে চলে আসেন।

তাঁর অন্যতম বিখ্যাত খলীফা শামসুল ওলামা হযরত মাওলানা সূফী গোলাম সালমানী (র) উল্লেখ করেন, একদিন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাহাদাত হোসেন বিহারী হযরত ওয়াইসী (র)-এর নিকট উপস্থিত হন। তখন হযরত ওয়াইসী (র) হাদীস শরীফ নিয়ে আলোচনা করতেছিলেন। উক্ত সময়ে হযরত মাওলানা শাহাদাত হোসেন হযরত ওয়াইসী (র)-কে বলেন যে, আপনি ইতিপূর্বে নবীজী (সা) সম্পর্কে যে সকল তথ্য

উপস্থাপন করেছেন তার সাথে হাদীস শরীফের কোন মিল নেই। তৎক্ষণাৎ প্রতিউত্তরে হযরত ওয়াইসী (র) বলেন যে, তাঁর কথা সঠিক ও যথার্থ এবং হাদীস শরীফে না থাকলেও তা নবীজীরই কথা। তখন হযরত মাওলানা শাহাদাত হোসেন পুনরায় বলেন, তিনি যেহেতু নিজে হাদীস শরীফ পড়ান কাজেই তিনি এ হাদীসের কোথাও সত্যতা পাননি। যে কারণে তিনি তা স্বীকার করে নিতে অপারগ। তৎক্ষণাৎ হযরত ওয়াইসী (র) হযরত মাওলানা শাহাদাত হোসেন (র)-এর প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকালেন। তৎক্ষণাৎ হযরত মাওলানা শাহাদাত হোসেন (র) বেহুঁশ হয়ে পড়েন। এতে করে হযরত ওয়াইসী (র) তাঁর মুরীদদেরকে হযরত মাওলানা শাহাদাত হোসেন (র)-এর মাথায় পানি ঢালতে বললেন। অতঃপর হযরত মাওলানা শাহাদাত হোসেন জ্ঞান লাভ করে সাথে সাথে হযরত ওয়াইসী (র)-এর কথা যথার্থ বলে স্বীকার করে নেন। তখন হযরত ওয়াইসী (র)-এর অন্যতম মুরীদ তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি একটু আগে বারে বারে অস্বীকার করলেন, এখন আবার স্বীকার করতেছেন কেন? তৎপ্রতিউত্তরে হযরত মাওলানা শাহাদাত হোসেন (র) বললেন, তিনি যখন বেহুঁশ (হুঁশহারা) ছিলেন, তখন নবীজী (সা)-এর দিদার তাঁর নসীব হয় এবং সাথে সাথে নবীজী (সা) তাঁকে বললেন যে, "ওয়াইসী (র) নবীজীকে কেন্দ্র করে যে সকল কথা বলেছেন তা সবই সত্য। তুমি আমার প্রিয় ওয়াইসীর প্রতি কখনও বিতর্কে যেও না।"

হযরত ওয়াইসী (র) মানবের যে কোন রোগ বীমার সলফ (ছিনিয়ে নেওয়া) করার প্রবল শক্তি রাখতেন। তিনি আঙ্গুল বা হাতের ইশারার দ্বারা মানুষের রোগকে ছিনিয়ে নিতেন। এতে করে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে রোগমুক্ত হয়ে যেত। একদিন হযরত ওয়াইসী (র) সেকালের যাতায়াতের বাহন পালকি করে তাঁর এক মুরীদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় পালকির এক বাহককে বিষাক্ত সর্প কামড় দেয়। সাপের কামড়ে পালকি বাহক যন্ত্রণায় কাঁদতে থাকে। সাথে সাথে হযরত ওয়াইসী (র) তাকে আশ্বস্ত করে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তার শরীর থেকে বিষ নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেন।

একদিন এক মসজিদে মাগরিবের নামাযের পর হযরত ওয়াইসী (র) তরীকতের তরতীব মতে মুরীদগণকে তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছিলেন। তখন তথায় কোন আলো ছিলো না। ঐ অন্ধকারে এক ব্যক্তি অপর এক অচেনা ব্যক্তির দ্বারা আঘাত পান। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ অচেনা ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করেছে বলে হযরত ওয়াইসী (র)-কে নালিশ করেন। ঐ ব্যক্তি তখন অভিযোগ অস্বীকার করলে হযরত ওয়াইসী (র) বললেন, এক জিন ঐ সময় তাঁর নিকট তাওয়াজ্জুহ

নিচ্ছিল। ঐ সময় অভিযোগকারীর একটি পা জিন মুরীদের শরীরে লাগায় জ্বীন মুরীদ তাকে আঘাত করে।

এখানে উল্লেখ্য, যেখানে হযরত ওয়াইসী (র)-এর অসংখ্য মানব মুরীদ ছিল সেখানে অগণিত জিন মুরীদ থাকা স্বাভাবিক।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর নানা (মাতামহ) পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। বারে বারে চিকিৎসা করেও কোন লাভ হচ্ছিল না। একদিন হযরত ওয়াইসী (র) তাঁর নানার পা স্পর্শ করার সাথে সাথে তাঁর পা-এর ব্যথা চলে গিয়ে তিনি সুস্থ হয়ে যান।

হযরত ওয়াইসী (র) মুরীদগণকে ছবক, তাওয়াজ্জুহ প্রদানের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন যান। তথায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর গমনের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তথায় একজন পীর সাহেব তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে হযরত ওয়াইসী (র)-তাঁর ব্যাগ থেকে কিছু চাউল ঐ পীর সাহেবকে খেতে দেন। চাউল খাওয়ার সাথে সাথে ঐ পীর সাহেবের শরীরে বিদ্যুতের মত চমক খেলে গেল এবং সাথে সাথে তাঁর সমস্ত লতিফা পূর্ণোদ্যমে চালু হয়ে যায়। এতে করে ঐ পীর সাহেব তাঁর মুরীদদের নিয়ে হযরত ওয়াইসী (র)-এর সোহ্বত লাভ করতে সচেষ্ট হয়ে যান।

ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল ড. শেখ আহমদ আলী উল্লেখ করেন—তিনি তার পীর সাহেব থেকে জানতে পেরেছেন হযরত ওয়াইসী (র)-এর ইন্তিকালের পর পর এক হিন্দু যুবক কলকাতার মুন্সিপাড়া লেইন, লালাবাগান, মানিকতলায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর মাযার শরীফে এক রাত্রি অতিবাহিত করেন। হিন্দু যুবক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তথায় অবস্থানকালে মাযার শরীফ হতে আলো বিকিরিত হতে দেখতে পান। এতে করে হিন্দু যুবকটি ভীত না হয়ে অলৌকিক কিছু দেখতে পাচ্ছেন বলে তথায় সারা রাত্রি অবস্থান করেন। এই হিন্দু যুবক হলেন বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দ। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িও ঐ এলাকায় ছিল বলে জানতে পারা যায়।

হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনের ছেলে হযরত এহসান আহমেদ মাসুমের স্ত্রী বর্ণনা করেন :

এক সময় কলকাতা তালতলা ওলিউল্লা লেইনের বিবি সালেটের মসজিদ সংলগ্ন ঘরে হযরত ওয়াইসী (র)-কে তাঁর কন্যা এক বালিকার পেট ব্যথার কথা অবগত করে দু'আ করতে অনুরোধ করেন। তখন হযরত ওয়াইসী (র) "আল্লাহ্

চাহেন তো বেদনা নাই” উক্তি করার সাথে সাথে বালিকাটি পেট ব্যথা থেকে মুহূর্তে মুক্ত হয়ে যায়।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর পুণ্যবতী কন্যা হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র) পুনাশির বাড়িতে একসময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় ডাক্তারগণ হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনের শেষ অবস্থা বলে মন্তব্য করতেছিলেন। তখন হযরত ওয়াইসী (র)-কে কলকাতায় এই সংবাদ জানানো হয়। খবর পেয়ে হযরত ওয়াইসী (র) কলকাতা থেকে পুনাশির পথে রওনা হয়ে যান এবং পথিমধ্যে হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনের সমস্ত রোগ সল্‌ফ করে দেন। হযরত ওয়াইসী (র) পুনাশি পৌঁছে হযরত জোহরা খাতুনকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখতে পান।

পুনাশিতে হযরত ওয়াইসী (র)-এর মামাতো শালিকা সাইয়েদা জারিয়া খাতুন দীর্ঘদিন যাবৎ ভীষণ পেটের অসুখে ভুগতেছিলেন। হযরত ওয়াইসী (র) দু'আ করার সাথে সাথে সাইয়েদা জারিয়া খাতুন দুঃসহ পুরাতন পেটের পীড়া হতে মুক্তি লাভ করেন।

হযরত ওয়াইসী (র) পুনাশিতে বাসগৃহ নির্মাণের পর সীমানা প্রাচীর নির্মাণকালীন মিস্তিরীগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন একপাশের সীমানা প্রাচীর সরায়ে দেওয়ার জন্য। যেহেতু ঐ স্থানে একজন আল্লাহ্‌র ওলীর কবর ছিল এবং তা আগে কেউ জানত না।

একদা পুনাশির খানকাহ শরীফে হযরত ওয়াইসী (র)-এর একজন মুরীদ এসে বিনীতভাবে বলতে থাকে যে তার কলব জারি হচ্ছে না। এতে হযরত ওয়াইসী (র) তাঁর নিজ জায়নামাযের উপর তাওয়াজ্জুহ নিক্ষেপ করেন। তাওয়াজ্জুহর প্রভাবে জায়নামাযটি আল্লাহ্ নামে প্রকাশিত হতে থাকে। তা দেখে ঐ মুরীদ নিজে নিজে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সে হালাল রোজগার দ্বারা আহার করে না। ফলে তার কলব জারি না হওয়ার কথা সে নিজেই স্বীকার করে।

পুনাশিবাসী খন্দকার এহসানুল হক সাহেব হযরত ওয়াইসী (র)-এর প্রিয় মুরীদ ছিলেন। তিনি আসামের কামরুপ শহরে কামাক্কায় জনৈক বৃদ্ধা জাদুকরের কবলে পতিত হন। ঐ বৃদ্ধা তার কন্যার সাথে খন্দকার সাহেবের বিবাহ দিতে চাওয়ায় খন্দকার সাহেব নিজ থেকে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ঐ বৃদ্ধা খন্দকার সাহেবকে পরপর তিনটি শক্তিশালী বান নিক্ষেপ করে। ইত্যবসরে সে বিপদকালে তিনি তাঁর পীর হযরত ওয়াইসী (র)-কে স্মরণ করলে পরে হযরত ওয়াইসী (র) সকলের অলক্ষ্যে তথায় উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধার জাদুবিদ্যা বিফল করে

দিয়ে তাকে নিস্তেজ করে দেন। তখন বৃদ্ধা খুশিমনে খন্দকার সাহেব থেকে ক্ষমা চায় এবং হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে।

কলকাতাস্থ হাওড়া শহরের ডাক্তার জাদু মিয়া বলেছেন-একবার পুনাশি গ্রামের মসজিদে হযরত ওয়াইসী (র) কতেক মুরীদসহ অবস্থান করতেছিলেন। তথায় হযরত ওয়াইসী (র) মোরাকাবা করার কিছুক্ষণ পর ঘর্মাক্ত অবস্থায় মোরাকাবা থেকে উঠেন। মুরীদগণ বিনীতভাবে তার তাৎপর্য জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, একটি হজ্জযাত্রীপূর্ণ জাহাজ সাগরে ডুবে যাচ্ছিল। মহান আল্লাহপাকের কৃপায় তিনি তা উদ্ধার করে দেন।

হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুনের পুত্র হযরত এহসান আহমেদ মাসুম বর্ণনা করেন, জিনগ্রস্ত রোগীগণকে হযরত ওয়াইসী (র)-এর নিকটে আনতে হতো না। শুধুমাত্র তাঁর আত্মীয় বা অভিভাবক এসে জানালে হযরত ওয়াইসী (র) বলতেন ঐ জিনরোগীর কাছে গিয়ে জিনকে হযরত ওয়াইসী (র)-এর সালাম বলতে বলেন। আত্মীয় বা অভিভাবক রোগীর কাছে গিয়ে তা বলার সাথে সাথে জিন ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যেত।

এক সময় হযরত ওয়াইসী (র) কলকাতার বিবি সালেটের মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তখন একজন হিন্দু সন্যাসী উপস্থিত হয়ে হযরত ওয়াইসী (র) কে সালাম প্রদান করেন। অতঃপর সন্যাসী বলেন, তাদের শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ লীলা দেখিয়েছেন। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা) কোন প্রকার লীলা দেখিয়েছিলেন কিনা? তখন হযরত ওয়াইসী (র) বলেন, লীলা দেখানোর জন্য আমাদের রাসূলের প্রয়োজন নেই। আমরা তাঁর গোলামরাই (উম্মতরাই) যথেষ্ট। এই বলে হযরত ওয়াইসী (র) বলেন, “আমি এখনই কারামত (লীলা) দেখাচ্ছি।” এই বলে অযূ করে দু'রাকাত নামায পড়লেন। অতঃপর সন্যাসীকে মসজিদ প্রাঙ্গণের গাছের দিকে দৃষ্টি দিতে আদেশ করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে গাছের প্রত্যেক পাতায় পাতায় হযরত ওয়াইসী (র)-কে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকার পর হযরত ওয়াইসী (র) মসজিদে ফিরে আসেন। তা দেখে উক্ত সন্ন্যাসী হযরত ওয়াইসী (র)-এর কদমে লুটিয়ে পড়েন এবং তওবা করে মুসলমান হয়ে তাঁর হাতে মুরীদ হন।

হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন (র)-এর পুত্র হযরত এহসান আহমেদ মাসুম (র)-এর স্ত্রী বর্ণনা করেছেন : পুনাশি গ্রামে হযরত ওয়াইসী (র)-এর মামাতো শালিকার জ্যেষ্ঠ পুত্র খন্দকার বজলে আজিম একবার পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য কলকাতায় হযরত ওয়াইসী (র)-এর মাযার শরীফে উপস্থিত হন।

তথায় যিয়ারতের কিছুক্ষণের মধ্যে মাযার হতে গম্ভীর স্বরে আওয়াজ বের হয় : "ঘরে যাও, ইনশাআল্লাহ্ পাস করবে।"

হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন বর্ণনা করেছেন : কলকাতাস্থ বিবি সালেটের মসজিদ সংলগ্ন বাড়িতে সপরিবারে অবস্থান কালে তাঁরা সবাই একদিন গভীর রাতে ওয়াইসী (র)-এর পশ্চাতে বসে মোরাকাবায় মগ্ন। এদিকে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। কলকাতা নগরীতে বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হয় এবং ঘরবাড়ি ভেঙ্গে পানি ও জঙ্গলে কলকাতা নগরী একাকার হয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের সামান্যতমও ক্ষতি হয়নি। তাঁদের ঘরবাড়ি অক্ষত ছিল এবং ঘরের মধ্যে নূন্যতম পানিও ঢোকে নি। ভোরে তাদের মোরাকাবা ভঙ্গ হয়।

হযরত ওয়াইসী (র)-এর অন্যতম খলীফা সামছুল ওলামা হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী (র)-এর কন্যার সন্তান কাজী নজীবর রহমান বর্ণনা করেন : আমিরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমেদ শহীদ ব্রেলভী (র)-এর অন্যতম মুরীদ ও খলীফা হযরত হাফেজ জামাল উদ্দিন (র)-এর সাথে হযরত ওয়াইসী (র)-এর আন্তরিক মোহাব্বত ও বন্ধুত্ব ছিল। তাই হযরত হাফেজ জামাল উদ্দিন (র) ওয়াদাবদ্ধ করতে চাইতেছিলেন যে ইন্তিকালের পর আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় যাতে উভয়ের কবর একই স্থানে হয়। তখন হযরত ওয়াইসী (র) বলেছিলেন, "ইনশাআল্লাহ্ তাই হবে।" তাঁর এই উক্তি মহান আল্লাহ্ পাক সফল করেন। অর্থাৎ কলকাতা নগরীর মানিকতলার একই কবরস্থানে মহান আল্লাহর উভয় ওলীর কবর সমাহিত হয়। অর্থাৎ হযরত ওয়াইসী (র)-এর মাযারের কয়েক মিটার পূর্ব পার্শ্বে হযরত হাফেজ জামাল উদ্দীন (র)-এর কবর।

কলকাতা নগরীর শেখ খোদা বক্স নামক এক ব্যবসায়ী বর্ণনা করেছেন, হযরত ওয়াইসী (র) কে তাঁর এক মুরীদ বলতে লাগলেন যে, তিনি এত পরিশ্রম করেতেছেন তারপরও তাঁর কল্‌ব জারি হয় না। প্রতিউত্তরে হযরত ওয়াইসী (র) বললেন, তুমি কি কোন সুদখোরের খাবার খেয়েছ। তখন ব্যবসায়ী বললেন যে, তার জামাতা সুদ খায় এবং তিনি তার জামাতার ঘরে খাবার খেয়েছেন। তখন হযরত ওয়াইসী (র) বললেন, সেই কারণে তার কল্‌ব জারি হচ্ছে না। তখন হযরত ওয়াইসী (র) তার নামাযের বিছানা মহান আল্লাহ্ পাকের নামের ফয়েজে প্রকম্পিত করে তা তাঁর মুরীদকে দেখিয়ে দেন।

এখানে উল্লেখ্য, ইবাদত-বন্দেগী কবুল হওয়াসহ তাকওয়া, পরহেজগারী, দীনদারীর পূর্বশর্ত যে কোন প্রকারের হারাম ভক্ষণ থেকে পরহেজ থাকা।

হযরত ওয়াইসী (র) কলকাতা নগরীর বিবি সালেট মসজিদে নিয়মিত তশরিফ রাখতেন। একসময় জনৈক ব্যক্তি/মুরীদ হযরত ওয়াইসী (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, তিনি নিয়মিত দরূদ শরীফ পড়ে থাকেন, কিন্তু নবীজী (সা)-এর ছায়া দেখতে পান, মূল আকৃতি দেখতে পান না। তার কথা শুনে হযরত ওয়াইসী (র) জানতে চান, দরূদ শরীফ কিরূপে পড়ে থাকেন তিনি ? প্রতিউত্তরে লোকটি বললেন, "আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মোহাম্মদ" পড়ে থাকেন। তখন হযরত ওয়াইসী (র) বললেন, "আল্লাহুমা সাল্লেআলা সাইয়েদেনা মোহাম্মদ" বলে তাঁর (হযরত ওয়াইসী (র) উসিলা ধরে চক্ষু বন্ধ করে দরূদ শরীফ পড়তে। ঐ ব্যক্তি তা করা মাত্রই নবীজী (সা)-এর দিদার তার ভাগ্যে জুটে গেল।

কোন এক সময় হযরত ওয়াইসী (র) তাঁর পুণ্যবতী কন্যা মোসাম্মৎ হযরত সাইয়েদা জোহরা খাতুন পৃথক পৃথক পালকি যোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক স্থানে কিছুটা দূরত্বে উভয় পাল্‌কি নামান হলো। মোসাম্মৎ সাইয়েদা জোহরা খাতুন তাঁর পিতাকে সংবাদ দিয়ে বললেন, তাঁর পালকি রাখার স্থানে গাঁজার দুর্গন্ধ পাচ্ছেন এবং তাতে করে তাঁর অত্যাধিক কষ্ট হচ্ছিল। ঐ স্থান হতে যেন পালকি সরিয়ে নেয়া হয়। এতে করে হযরত ওয়াইসী (র) পালকি সরানোর আদেশ দিয়ে বিষয়টির উপর তথ্য তালাশ করতে লাগলেন। তখন ঐ স্থানের প্রবীণ লোকেরা বললো যে, সাইয়েদা জোহরা খাতুনের পালকি রাখার স্থানে বহু বছর পূর্বে একজন গাঁজাখোর লোক থাকত।

হযরত ওয়াইসী (র) যখন সপরিবারে কলকাতা কড়েয়া রোডের বিবি সালেট মসজিদের নিকটবর্তী এক ঘরে বসবাস করছিলেন, সে সময় তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিনী তাঁর অগোচরে কিছু অলঙ্কার ক্রয় করেছিলেন। তাঁর অগোচরে আর ব্যাপারটি থাকেনি। কাশ্‌ফ যোগে তিনি জানতে পেরে স্ত্রীকে সেই গহনাগুলো বিক্রি করে দিতে উপদেশ দেন। কারণ, হযরত রাসূল (সা)-এর দাসানুদাস হয়ে স্বর্ণ-ব্যবহার ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনে তিনি লজ্জা ও ভীতি বোধ করেন। যেহেতু হযরত রাসূল (সা) ও তাঁর পরিবারবর্গ দৈন্যের মধ্যে অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর উপদেশে তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রী অতঃপর স্বর্ণালঙ্কারগুলো বিক্রি করে দেন।

চট্টগ্রাম গারাংগিয়া হযরত বড় হুযূর (র)-এর অন্যতম খলীফা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কদমতলী জামে মসজিদের খতিব হযরত মাওলানা কামাল উদ্দিন মজিদী বর্ণনা করেন, তিনি চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মরহুম হযরত মাওলানা মোজাফ্‌ফর আহমদ (র) থেকে শুনেছেন, দেওবন্দ

থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁরা হযরত ওয়াইসী (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কথা প্রসঙ্গে বলেন, হুযূর আপনার আমল ও চাল-চলন শরীয়ত সম্মত। কিন্তু আপনি একটি বিদআত কাজ করেন আর তা হলো কিয়াম করা। যা হাদীস শরীফ দ্বারা ছাবেত নেই। তখন হযরত ওয়াইসী (র) বলেন, কিয়ামের কথা বুখারী শরীফে ছাবেত আছে। হযরত ওয়াইসী (র)-এর কথায় দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমগণ আশ্চর্য হয়ে যান। যেহেতু বুখারী শরীফের প্রতিটি হাদীস শরীফ তাঁদের জানা রয়েছে। তখন দেওবন্দের আলেমগণ জানতে চান কোন হাদীস শরীফে কিয়ামের পক্ষে বলা আছে। প্রতিউত্তরে হযরত ওয়াইসী (র) বলেন, প্রতিটি হাদীস শরীফে কিয়ামের পক্ষে বলা আছে এবং আপনারা যে হাদীস শরীফই পড়ুন না কেন কিয়ামের কথা পাবেন। তখন দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমগণ একটি বুখারী শরীফ নিয়ে তথা হতে একটি হাদীস শরীফ পড়তে শুরু করেন। পড়ার প্রারম্ভে যখন কোয়ালা কোয়ালা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতে শুরু করেন তখন নবীজীর জলোয়ায় কক্ষ পূর্ণ হয়ে দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমগণ নবীজীকে দেখামাত্র ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্ বলে দাঁড়িয়ে পড়েন। অতঃপর দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমগণ অনুতপ্ত হয়ে হযরত ওয়াইসী (র) থেকে ক্ষমার সাথে বিদায় নিয়ে নেন এবং তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন।

তথ্যসূত্র

১. দিওয়ানে ওয়াইসী (ফার্সী)-ভারত
সংকলন হযরত সাইয়েদ এহসান আহমদ মাসুম
(হযরত ওয়াইসীর (র) পৌত্র) শাহপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত

২. দিওয়ানে ওয়াইসী (বঙ্গানুবাদ) ঢাকা
সাইয়েদ জানে আলম, (হযরত ওয়াইসীর (র) পৌত্র)-ঢাকা

৩. সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসীর পবিত্র জীবন-চরিত
সাইয়েদ আবদুল মতিন জাহাঙ্গীর-শাহপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত

৪. হায়াতে ওয়াইসী
হযরত মাওলানা জয়নুল আবেদীন আখতারী, কলকাতা, ভারত

৫. আয়নায়ে ওয়াইসী (উর্দু)-ভারত
ড. মতিউর রহমান-প্রফেসর, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার, ভারত

৬. ছফিনায়ে সফর (বঙ্গানুবাদ)
হযরত মাওলানা আহমদ আলী সুরেশ্বরী, শরীয়তপুর, বাংলাদেশ

৭. হযরত ওয়াইসী (র) জীবন-ইতিহাস
ড. শেখ আহমদ আলী, কলকাতা, ভারত

৮. বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ
মাওলানা ওবায়দুল হক, চট্টগ্রাম

৯. সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (র) জীবন ও কর্ম (প্রবন্ধ)
ড. এ. আর. এস. আলী হায়দর, প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
আজিমপুর দায়রা শরীফ

১০. সূফী সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ্ (র)

১১. গারাংগিয়া হযরত বড় হুযূর (র)
আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম

১২. আল ওয়াইসী বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৭
ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন, কলকাতা, ভারত

১২. মাওলানা শাখাওয়াত হোসেন

অধ্যক্ষ, নেছারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

১৩. মাওলানা আজিজুল ইসলাম

উপাধ্যক্ষ, বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

১৪. আবুল কাশেম চৌধুরী

হাজীপাড়া, মল্লিক ছোবহান, আমিরাবাদ ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম

১৫. সাইয়েদ মোহাম্মদ নূরুল কবির

সাইয়েদ পাড়া, আমিরাবাদ, চট্টগ্রাম

১৬. কফিল উদ্দিন মাহমুদ

ছাগলনাইয়া, ফেনী, বাংলাদেশ।

ইফা—২০১২-২০১৩—প্র/১০৩৬২(য়া)—৩,২৫০